ইন্দুমতী।

(সামাজিক উপন্যাস।)

শ্রীযশোদালাল তালুকদার

প্রণীত।

Calcutta:

PUBLISHED BY

JOGESH CHANDRA BANDOPADHYA

CANNING LIBRARY

Price One Rupee only.

CALCUTTA
Printed by Abinash Chandra Roy
SEALDAH PRESS.
10, Upper Circular Road

আমাব

প্রত্যক্ষদেবতা

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র তালুকদার

পিতৃ দেবের

পবিত্র পাদপদ্মে,

এই গ্রন্থ

ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।

নিবেদন।

ক্ষুদ্র হৃদয়, শক্তি সামান্য। কাজেই, সাধনা অসম্ভব। অথচ প্রবল অভিলাষ, উপন্যাসের উন্নতি কল্পে। এবিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা "ইন্দুমতীর" আদরেই বুঝা যাইবে। ইত্যলং।

কলিকাতা,
১৬ই ভাদ্র,
১৩০১ সাল।

শ্রীযশোদালাল তালুকদার।

কৃতজ্ঞতা।

আমার সাহিত্য-গুরু মাননীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার (নবজীবন ও সাধারণী সম্পাদক) মহাশয়ের অক্ষয়-করুণা-চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ-কিরণ প্রভায়, আজ সাহিত্য-ক্ষেত্রে ''ইন্দুমতী' প্রদীপিত হইল। তাঁহার সেই স্বভাব-সুলভ করুণা-কিরণ-প্রভায় প্রবঞ্চিত হইলে, "ইন্দুমতী" সাহিত্য-জগতে দাঁড়াইতে পারিত কি না, সন্দেহের বিষয় ছিল। আমি নিরতিশয় আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, তিনি আমাকে বেশ একটু স্নেহ করেন। সেই স্নেহবশত তাঁহার নিকট, আশার অতিরিক্ত উপকার পাইয়াছি। তাঁহার পরোপকার ব্রতে ও মহত্ত্বতায় চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। এখন ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে তাঁহার ধর্ম্মোন্নতি প্রার্থনা করি।

শ্রীযশোদালাল তালুকদার।

অভিমত।

যশোদার প্রতি আমার বেশ একটু স্নেহ আছে। স্নেহের চক্ষে সকলই ভাল—সুতরাং ইন্দুমতীও ভাল লাগিয়াছে। আর ইন্দুমতীকে ভালবাসি তাহার কবিত্বময়ী বেশভূষা ও লালিত্যময়ী ভঙ্গির জন্য। তবে যশোদার বয়োবৃদ্ধির সহিত জ্ঞান ও গুণপনার বৃদ্ধি হইলে, যে তাহার উপন্যাস আরও ভাল হইবে, তাহা অবশ্য না বলিলেও চলে। কালে যে সেইরূপই হইবে এমন আশাও করি ও আশীর্ব্বাদও করি।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।



ইন্দুমতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পথিমাঝে।

সন্ধ্যা কাল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। শোঁ, শোঁ, শোঁ, অনবরত পবন হাঁকিতেছে। গুডুম্, গুডুম্, মেঘ ডাকিতেছে। পথে চলিবার শক্তি নাই। চতুর্দ্দিকে যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত। নীচে বৃক্ষাবলী ভাঙ্গিতেছে—পড়িতেছে—কড়্ কড়্, মড়্ মড়্। গৃহের খড় ও চাল উড়িতেছে—পড়িতেছে। ঊর্দ্ধে

মেঘান্তরালে থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ-বিভ, বক্রগতিতে আকাশ জুড়িয়া খেলিতেছে। দিগন্তব্যাপী ভীষণ বজ্র-নিনাদে, জগত প্রকম্পিত ও স্তম্ভিত হইতেছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শিলাও পড়িতেছে। পথে দাঁড়ায় এমন কোন আশ্রয় নাই।

এমন সময়, নরেন্দ্রনাথ পথিমাঝে। একাকী। ঝড়ের কঠোর উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া, তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। কিন্তু, চলিতে চলিতে হঠাৎ পা পিছলিয়া পড়িয়া গেল। গুরুতর আঘাত পাইল, তথাপি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। যেমন চলিতেছিল, তেমনি, চলিতে লাগিল ভয়ে ভয়ে। ঝাপ্টা বাতাসে, নরেন্দ্রনাথের উড়ানী খানা উড়িয়া গিয়া শূন্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। উড়িতে উড়িতে একটা গাছের মাথায় যাইয়া, পাগ্‌ড়ীরূপে বিরাজ করিতে লাগিল। তখন সেই বৃক্ষটি, অন্যান্য বৃক্ষের নিকট আমীর-রূপে পরিচয় দিতে লাগিল। সহসা পৃথিবী আবার ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইল। চলিবার পক্ষে বিষম অন্তরায় ঘটিল। মাঝে মাঝে তড়িৎ উদ্ভাসিত হইতেছিল সত্য, কিন্তু, তত ঘন ঘন নহে। বিশেষত বিদ্যুৎ দীপ্তিতে চলিবারও সুবিধা নাই। তাড়িতালোক ক্ষণস্থায়ী—এই আছে, এই নাই। চোখের পলক সয় না। কাজেই তাতে আর কতক্ষণ চলা যায়? নরেন্দ্রনাথের মনে বড় ভয় হইল। আঁধার—বিষম আঁধার দেখিয়া, আর চলিতে সাহস জন্মিল না।

তখন একটী বৃক্ষের নীচে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, অনতিদূরে একটী ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। আলো দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথের মনে কিছু ভরসা হইল। ভাবিল, এই ঝড় বাদলের সময়, লোকালয় ভিন্ন অপর স্থানে আলো থাকিবার সম্ভাবনা কি? ওখানে যাইতে পারিলে, বোধ হয়, আশ্রয় পাইতে পারিব। এই দুঃসময়ে কি আশ্রয় দিবে না? রক্ত মাংসের শরীর হইলে অবশ্য আশ্রয় দিবে। এই ভরসায় আলোকাভিমুখে চলিল। ক্রমে ক্রমে আলোর নিকট আসিল। দেখিল, যথার্থই একটী ক্ষুদ্র গৃহাভ্যন্তরে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে। কপাটে আঘাত করিল, কপাট খুলিল না। উপর্য্যুপরি দুই চারি বার পর, গৃহের ভিতর হইতে বলিল,

"কে, গো?"

নরেন্দ্র। আমি পথিক, বড় বিপন্ন, এখানে আশ্রয় পাইতে পারি কি?

পুনরায় ঘরের ভিতর হইতে উত্তর হইল,

"আসুন।"

বলিতে বলিতে কপাটের অর্গল খুলিয়া দিল। কপাট খুলিবামাত্র প্রবল বাতাসে প্রদীপটি নিবিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ, গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিল। এবং তড়িৎ প্রভায় দেখিতে লাগিল। দেখিল, গৃহটি দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। নরেন্দ্রনাথ যে খণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই খণ্ডের মেঝেটি

বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গৃহ সামগ্রী বড় বেশী কিছু দেখিতে পাইল না। কেবল দেখিল, এক পাশে একটী ভগ্ন পালঙ্ক, পালঙ্কোপরি চাল ডাল রাখিবার উপযোগী কতকগুলি হাঁড়ি কুঁড়ি। এবং খাওয়া দাওয়ার উপযুক্ত দুই চারি খানি তৈজসপত্র। গৃহের সম্মুখের বেড়াতে কয়েকখানা বড় বড় জগন্নাথের পট। পটগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশ খণ্ড দ্বারা সংরক্ষিত। পটের কোন খানা খসিয়া পড়িতেছে, কোন খানা মাকড়সার জালে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে, কোন খানার বা চিত্র উঠিয়া যাইতেছে।

গৃহের ভিতরে, নরেন্দ্রনাথ, প্রবেশ করিলে পর, একটী বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল,

"আপনার নাম কি?"

নরেন্দ্র। নরেন্দ্রনাথ রায়।

বৃদ্ধ, নামটি শুনিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং বিনীত ভাবে নরেন্দ্রনাথকে নমস্কার করিল। নমস্কার করিয়া, নিজে যে মাদুরে শয়ন করিয়াছিল, তাহা উঠাইয়া আনিয়া বসিতে দিল। পরে, আলো জ্বালিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু, আলো জ্বালিতে পারিল না। গৃহে আগুন ছিল না। নরেন্দ্রনাথ, বসিয়া বলিল,

"এ বাড়ী কা'র?"

বৃদ্ধ, নীরব। এ প্রশ্নে বৃদ্ধের হৃদয়ের নির্ব্বাপিত বহ্নি

যেন পুনরায় প্রখর ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ, সেটি বুঝিল না। বলিল,

"নীবব বৈলে যে?"

বৃদ্ধ, তখন বড়ই বিষাদের সহিত বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল,

"আপনি এ গ্রামেব জমিদারেব পুত্র। আপনার নিকট কিছু গোপন কবিব না। এ বাড়ীব কর্ত্তৃপক্ষ কেহ নেই।"

বৃদ্ধ, নবেন্দ্রনাথকে চিনিত।

নবেন্দ্রনাথ, বৃদ্ধেব মুখে আপনাব পবিচয় শুনিয়া, কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বলিল,

"তবে তুমি কে?"

বৃদ্ধ, ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল,

"আমি এ বাড়ীব ভৃত্য।"

এখন বৃদ্ধটিব অন্য পবিচয় নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য পরিচয়, আবশ্যক মত বলিব। কেবল নামটি বলিলেই যথেষ্ট হইবে। নাম—রামভদ্র।

নরেন্দ্রনাথ, বলিল,

"এখানে তুমি কি কর?"

রামভদ্র, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,

"দুটি স্ত্রীলোকের রক্ষায় নিযুক্ত আছি।"

নবেন্দ্রনাথ, অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বলিল,

"তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

রামভদ্র, বিষণ্ণভাবে কহিল,

"সে বিষাদ-কাহিনী বলিতে অভিলাষ করি না।"

এই বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

তখন নরেন্দ্রনাথের মনে, প্রকৃত ঘটনাটি জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত কৌতূহল জন্মিল। আগ্রহের সহিত বলিল,

"যদি বলিলে কোন ক্ষতি না হয়; তবে, বলিতে পার।"

নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাস, ইহারা অত্যন্ত গরীব লোক। এবং খুব অভাবে নিপতিত। বোধ হয়, ভালরূপ খাইবার পরিবার জুটিয়া উঠে না। এটি বিবেচনা করিয়া, মনে মনে ভাবিল, যতদূর পারি, এদের অভাব মোচন করিতে যত্ন করিব। এবং পারি যদি, তবে, ভদ্র সমাজে নিদা, না হয়, বাস স্থান করিয়া দিব।

রামভদ্রও নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া, ঘটনাটি বলিতে ইচ্ছুক হইয়াও আবার কি ভাবিয়া বলিল না। কেবল এইমাত্র বলিল যে, অদ্য সে বিষয়ে ক্ষমা করিবেন। অনুগ্রহ করিয়া, আর একদিন আসিবেন। পরিচয় দিতে হইলে সেই দিনই দিব।

নরেন্দ্রনাথ দেখিল, রামভদ্র, আজ কোন প্রকারেই বলিতে ইচ্ছুক নহে। তখন অগত্যা আর এক দিন আসিবে বলিয়া, মনে মনে ঠিক করিল। এবং উঠিয়া চলিল।

রামভদ্র, নরেন্দ্রনাথকে উঠিতে দেখিয়া, নিরতিশয় নিরীহ ভাবে বলিল,

"আর একদিন আসিবেন ত?"

নরেন্দ্র। আসিব।

রাম। গরিবের কথা ভুলিবেন না ত?

নরেন্দ্র। না। নিশ্চয়ই আসিব।

কথায় কথায় অনেক সময় কাটিয়া গেল।

তখন বৃষ্টি ও ঝড় থামিয়া গিয়াছে। আকাশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চাঁদ উঠিতেছে—ধীরে ধীরে। তারা ফুটিতেছে, একে একে। নরেন্দ্রনাথও পরিষ্কার রজনী দেখিয়া, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জিজ্ঞাসা।

প্রভাতে শৈলবালা আসিয়া, রামভদ্রকে জিজ্ঞাসা করিল,

"রামভদ্র, গত রজনীতে কে এসেছিলেন?"

রামভদ্র, শৈলবালার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। এবং আত্মভাব গোপন করিয়া কহিল,

"কৈ, না? কেহ ত আসে নাই।"

শৈলবালা, গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল,

"ছি! তোমার তিনকাল গেছে; এক কাল আছে। আজ বাদে কাল মরিবে; এখনও মিথ্যা কথা ছাড়িতে পারিলে না? ধিক্, তোমার জীবনে!"

শৈলবালা, বিগত রজনীর সমস্ত ঘটনাই জানিত—কিছু অস্পষ্ট। রামভদ্র, শৈলবালার এ কথায় যেন থতমত হইয়া গেল। বলিল,

"মিথ্যা বলিব কেন?"

শৈলবালা, এবার চক্ষু রাঙ্গাইয়া কহিল,

"আবারও সেই কথা ?—"

রামভদ্রের বয়স ষাট্‌ কি সত্তর হইবেক। এখনও বেশ সবল ও তেজস্বী। শরীরের অবয়ব দেখিয়া, কেহই বয়সের অনুমান করিতে পারে না। এখনও হাঁটিয়া পাঁচ ছয় ক্রোশের পথ যাইতে পারে। এত যে বয়স হইয়াছে, তথাপি হাঁটিবার সময়, কোথাও বসিয়া বিশ্রাম করে না। রামভদ্রের প্রাণের প্রতি বড় মমতা। পথে বসিলে, যদি কেহ মাথায় লাঠি মারিয়া, সঙ্গের জিনিষ পত্র লইয়া যায়; সেই ভয়েও কোথায় বসে না। রাত্রিতে রামভদ্র, গৃহের বারেন্দায় শয়ন করিয়া থাকে। আর কত কি স্বপ্ন দেখে। কখনও স্বপ্ন দেখে, শৈলবালা যেন তাকে জোড় পা করিয়া, ভাত দিতেছে—ডাল দিতেছে—মাছের ঝোল সহ মাছ দিতেছে। আবার কখনও স্বপ্ন দেখে, শৈলবালা যেন তার পাশে বসিয়া, কত কৌতুক, কত পরিহাস, কত হাসি তামাসা, কত গালগল্প করিতেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে রামভদ্রও যেন হাসিতেছে। হাসিতে হাসিতে যেন তার পেটের নাড়ীভূড়ী ছিঁড়িয়া যাইতেছে। শৈলবালা, রামভদ্রকে ভাত দেয়, কাছে বসিয়া দু-দশটা হাসি তামাসার কথা বলে; আর মাঝে মাঝে এক আধ-টুকু চিকণ হাসি হাসে। রামভদ্র, সে সমস্তই রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া থাকে।

রামভদ্রের, আর একটি দোষ বা গুণ যাহাই বলুন, সে রাত্রিতে উঠিয়া উঠিয়া ১০।১৫ ছিলিম তামাক খাইয়া থাকে। তামাক খাইতে উঠিয়া, শৈলবালাকে জিজ্ঞাসা করে, যে তার ঘুম হইয়াছে কি না? রাত্রি বেশী নাই, প্রভাতের তারা উঠিয়াছে, ইন্দুরে তার তামাকের পাতাটি লইয়া গিয়াছে, টাকা কোথায় রাখিয়াছে, খুঁজিয়া পাইতেছে না; প্রভৃতি নানা কথা বলিয়া, আবার শয়ন করিয়া থাকে। সেই সময়, শৈলবালা জাগিয়া থাকিলে, দু এক কথার উত্তর দিয়া, আবার ঘুমায়। আর যে দিন শৈলবালা ঘুমাইয়া থাকে; অথবা জাগ্রতাবস্থায়ও কোন উত্তর দেয় না, সেই দিন উপর্য্যুপরি কেবলি কাশিতে থাকে। এবং সে দিন তামাকের শ্রাদ্ধ কিছু বেশী পরিমাণে হয়। সেই কাশির ও হুকার জলের গুড় গুড় শব্দে, শৈলবালা জাগিয়াও কোন উত্তর দেয় না। কেবল রামভদ্রের তামাসা দেখে এবং আপনা আপনি হাসিতে থাকে।

যা'ক, সে সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই। রামভদ্র, শৈলবালার তিরস্কার-পূর্ণ কথা শুনিয়া ভাবিল, শৈলবালা তার উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াছে। আজ আর জোড় পা করিয়া, ভাত দিবে না, হাসিবে না, ভালরূপ কথাও বলিবে না। এ সব ভাবিয়া চিন্তিয়া অপ্রতিভ হইয়া রহিল।

শৈলবালা, পুনরায় কহিল,

"রামভদ্র, বল, কে এসেছিলেন?"

এই বলিযা, ঈষৎ হাসিল।

রামভদ্র, শৈলবালাব হাসি দেখিযা, গলিযা গেল। মনে মনে ভাবিল, মান থাকিতে বলাই ভাল। বলিল,

“কাহাকেও ত বলিবে না? তোমাদেব পেটে ত কথা পচে না।”

শৈলবালা, বিবক্ত ভাবে বলিল,

“তুমি আমায কচীখুকী মনে কবেছ নাকি?”

বামভদ্র, মনে মনে বলিল, তুমি কচীখুকী হ’তেও বেশী। প্রকাশ্যে বলিল,

“জমিদাব পুত্র।”

শৈল। কোথাকাব জমিদাব পুত্র?

বামভদ্র। এ গ্রামেব!

শৈল। কেন এসেছিলেন?

বামভদ্র। বাত্রিতে ভযানক ঝড গিযাছে ত জান?

শৈল। জানি। তাব কি?

রামভদ্র। সেই ঝড়ে কোন আশ্রয় না পাইয়া; এখানে এসেছিলেন।

শৈলবালা। ভাল, আর একদিন আসিতে বলিলে কেন?

রামভদ্র যে, নবেন্দ্রনাথকে আব একদিন আসিতে বলিযাছিল, শৈলবালা, গৃহেব অপব খণ্ড হইতে, সেই কথাটি স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিল। রামভদ্র কিন্তু সেটি টের

পায় নাই, কাজেই শৈলবালার কথা শুনিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, শৈলবালার কাণে, এসব কথা গেল কি প্রকারে? কিছু বলিয়া সারিবার উপায় নাই। সকল কথাগুলিই না জানি কি করিয়া শুনিয়া ফেলে। শৈল, বড় দুষ্ট। আজ হইতে বাড়ীতে আর কোন কথা বলা হইবে না। এই ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিল।

শৈলবালা, রামভদ্রকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া, বলিল,

"বল, আসিতে বলেছ কেন?"

রামভদ্র, ভাবিয়াছিল, প্রাণান্তেও একথা কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না। কিন্তু, শৈলবালার যন্ত্রণায় আর প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল,

"প্রয়োজন আছে।"

শৈলবালা, আবার প্রশ্ন করিল,

"কি প্রয়োজন?"

রামভদ্র, এবার একটু রাগত ভাবে বলিল,

"সব কথাই তোমাকে বলিতে হইবে নাকি?"

শৈলবালাও রাগিয়া বলিল,

"বলিবে বৈ কি? একশ' বার বলিবে।"

রামভদ্র। যাও, আমি বলিব না।

শৈলবালা, মুখভঙ্গি করিয়া কহিল,

"যাচ্ছি গো, যাচ্ছি! দেখি, আজ তুমি কি খাও।"

শৈলবালা, চলিয়া যাইবাব ভাণ কবিল।

বামভদ্র, চড়ে চড় খাইল। অনুপায ভাবিযা, তাড়াতাড়ি শৈলবালাব হাত ধবিল। কিন্তু, শৈলবালা, হাত ঝাড়া দিযা কহিল,

"হাত ছাড়! আমি তোমাব কথা শুনিব না।"

রামভদ্র, অত্যন্ত কাতবতাব সহিত বলিতে আবস্ত কবিল, "ছি, শৈল। বাগ কব কেন? তোমাব নিকট না বলিলে, আব কা'ব নিকট বলিব? তোমাব সহিত একটু গল্প কবিলাম বৈত নয়।"

শৈলবালা বুঝিল, রামভদ্র ভয পাইযাছে। এখন সকল কথাই বাহিব হইবে। বুঝিযা শান্ত হইল। বলিল,

"ভাল, এখন বল।"

তথন বামভদ্র, শৈলবালাব নিকট চুপি চুপি কত কি বলিল। শৈলবালা, শুনিয়া হাসিতে হাসিতে চলিযা গেল। রামভদ্রও ডাবা হুকা নিযা তামাক ধ্বংস কবিতে বসিল।

উপর্য্যুপবি তামাক খাওয়া, বামভদ্রেব একটী মহৎ দোষ।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:**:—

পুনরাগমন।

নরেন্দ্রনাথ, কখনও প্রতিশ্রুত বিষয়ের অন্যথাচরণ করে না। রামভদ্রের কথানুযায়ী, পুনরায় সেই ভবনে উপনীত হইল। রামভদ্র, নরেন্দ্রকে দেখিয়া পরমানন্দিত হইল। এবং সসম্ভ্রমে কহিল,

"এসেছেন ? ভালই হইয়াছে। দরিদ্রের কথা যে স্মরণ আছে ; এই যথেষ্ট।"

নরেন্দ্রনাথ, ঈষৎ হাসিয়া কহিল,

"জগতে সকলেই দরিদ্র।"

মোটা বুদ্ধি সম্পন্ন রামভদ্র, নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া জিভ্ কাটিল। বলিল,

"ছি। তা কি বলিতে আছে। আপনারা হ'লেন বড় লোক।"

নরেন্দ্র। তুমি আমার কথা বুঝিতে পার নাই। জগতে যার যে বিষয়ে অভাব, সে সেই বিষয়ের দরিদ্র। বড় মানুষেরও দরিদ্রতা আছে।"

রামভদ্র, এবারও নরেন্দ্রনাথের কথা বুঝিতে পারিল না। বলিল,

"সে কি? বড় মানুষের আবার অভাব কি?"

নরেন্দ্রনাথ, হাসিল। কহিল,

"বড় মানুষের বুঝি অভাব থাকিতে পারে না? মনে কর, যার অর্থ নাই, সে অর্থের দরিদ্র, যার হৃদয়ে নিয়ত অসুখ, সে সুখের দরিদ্র, আর যার অন্তরে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, দয়া ও ভালবাসা প্রভৃতি কিছুই নাই, সে এ সবার কাঙ্গাল। বড় মানুষের সবই থাকে কি? এখন বুঝিলে জগত দরিদ্রতাময় কেন?"

রামভদ্র ও হাসিল। কহিল,

"আপনি কিসের কাঙ্গাল?"

নরেন্দ্রনাথ, নীরব।

রামভদ্র, কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াই ভাবিতেছিল, যে কি প্রকারে ইন্দুমতীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবে। তার মোটা বুদ্ধিতে সেটি যোগাইতে পারিতেছিল না। কাজেই রামভদ্রের মন ঐ বিষয়েই তন্ময় ছিল। নরেন্দ্রনাথ, কথার

উত্তর দিল কি না দিল—তৎপ্রতি লক্ষ্যও ছিল না। কিয়ৎকাল পর, একটী অসংলগ্ন প্রশ্ন করিল,

"আপনার বড় কষ্ট হয়েছে।"

নরেন্দ্রনাথ, মনে মনে হাসিল। কহিল,

"কেন?"

রামভদ্র। এতদূর পরিশ্রম ক'রে এসেছেন।

নরেন্দ্র। তার জন্য কি? এ তো সামান্য পরিশ্রম। আসিতে বলেছিলে কেন?

এ কথা শুনিয়া, রামভদ্র হাতে যেন আকাশ পাইল। ইন্দুমতীর প্রসঙ্গ উঠাইতে আর কোন প্রকার ঠেকিল না। বলিল,

"সে সব কথা এখানে বলিতে পারিব না। চলুন, একটু নির্জ্জনে যাই।"

শৈলবালার ভয়ে বুঝি?

নরেন্দ্রনাথ। চল।

বাড়ীর সদর রাস্তার অগ্রভাগে, একটী বকুল গাছ ছিল। উভয়ে সেই বকুল তলায় আসিয়া বসিল। বকুল গাছটির শাখা প্রশাখা গুলি শোভাময়ী সুষমায় চতুর্দ্দিকে প্রসারিত। ডালে ডালে স্তবকে স্তবকে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ভ্রমর-কুল, আকুল প্রাণে, মধু লোভে প্রমত্ত হইয়া, উড়িতেছে—বসিতেছে; বসিয়া বসিয়া আবার উড়িতেছে। এবং তাহাদের পক্ষ বিলোড়নের সুমধুর ধ্বনি হইতেছে। পরিপক্ক

বকুল খাইবার নিমিত্ত দুটি কোকিল, এডালে ওডালে ঘুরিতেছিল। এবং কুহু কুহু করিয়া ডাকিতেছিল। রামভদ্র কিন্তু কোকিলের মধুর ডাকেও বিরক্ত হইতেছিল। কারণ, বকুল তলায় আসিয়া, ইন্দুমতী ঘটিত কথা, আবার উল্লেখ করিতে পারিতেছিল না। জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া আসিতে ছিল। সহসা নরেন্দ্রনাথের হাতে ধরিল। বলিল,

"মহারাজ, আমার একটী কথা রাখিবেন?"

নরেন্দ্রনাথ, বিস্মিত হইল। কহিল,

"কথাটি কি?"

রামভদ্রের শরীর কাঁপিতেছিল। বলিল,

"যে কথাই হউক, রাখিবেন ত? কোন মন্দ কথা নহে।"

নরেন্দ্রনাথের বিস্ময় আরও বাড়িল। বলিল,

"উপযুক্ত বিবেচনা করিলে রাখিব।"

রামভদ্র। বলিতে ভয় হয়।

নরেন্দ্রনাথ, ঈষৎ হাসিল। কহিল,

"ভয় কি? বল।"

তখন রামভদ্র, সাহস পাইয়া, নরেন্দ্রনাথের কাণে কাণে গুটিকতক কথা বলিল। নরেন্দ্রনাথ, কথাগুলি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিল। এবং নিতান্ত নিরীহ ভাবে বলিল,

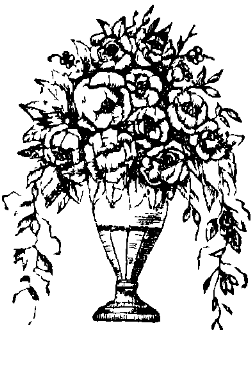
"আমার কোন অমত নাই। বাবার মত হইলেই হয়।"

রামভদ্র। আমি সে বিষয় ঠিক করিব।

নরেন্দ্র। পার, ভালই।

এই বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ, উঠিয়া চলিল। বকুল গাছের কোকিল দুটিও মারামারি করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

কেবল রামভদ্র, সেখানে বসিয়া বসিয়া কি জানি কি ভাবিতে লাগিল।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্রনাথ কে ?

হাসিকান্না গ্রামের জমিদার, শম্ভুনাথ রায়। রায় মহাশয় বিপুল অর্থ, যশ ও মান সঞ্চয় করিয়াছেন। গ্রামের বাহিরেও বেশ প্রতিপত্তি আছে। দেশে বিদেশে, সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু জমিদারী আছে। জমিদারীতে বার্ষিক প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর কাযকর্ম্মেও প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয় হয়। যাঁহার বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা আয়, তার প্রতি লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে, বলিতে হইবেক। লক্ষ্মী, রায়মহাশয়ের ভাণ্ডারে নিয়ত বিরাজমানা। জমিদার বাবুর গৃহিণী, পরমাসুন্দরী ও লক্ষ্মীস্বরূপা। পত্নীর সুব্যবহারে রায়মহাশয় বড়ই প্রীত। বড় লোকের যে প্রকার বাড়ী ঘর হইয়া থাকে ;

রায় বাড়ীও তদ্রূপ। ববং কোন কোন অংশ বিশেষ পারিপাট্যের সহিত গঠিত। বাড়ীটি পাঁচ মহলে বিভক্ত,—

প্রথম মহল—বাহির বাড়ী। বাহির বাড়ীতে অনেকগুলি বড় বড় কুঠি। তার এক এক কুঠিতে স্কুল ঘর, ডাক্তার খানা, রঙ্গমহল ও কর্ম্মচারীদের বাসস্থান। বাহির বাড়ীর মধ্যস্থলে, একটী প্রকাণ্ড চত্বর। চত্বরের ঠিক মাঝখানে, একটী ইষ্টক বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চাতে একটী প্রকাণ্ড কুম্ভীর ও একটী বড় কচ্ছপ। লোকে সে দুটাকে দেখিবার সময় পড়িয়া না যায়, তন্নিমিত্ত চৌবাচ্চার চারিধারে রেলিং দেওয়া। আবার চত্বরের পর সুদীর্ঘ পুকুর। পুকুরের উত্তর পারে ফুলের বাগান, দক্ষিণ পারে সদর রাস্তা। সদর রাস্তার শেষ সীমানায়, হাট বাজার। তারপর খাল,—নদীর সহিত সংযুক্ত।

দ্বিতীয় মহল কাছারী বাড়ী। এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হইলে, একটী সিংহদ্বার পার হইতে হয়। সিংহদ্বারের উপরে একধারে সিংহ, অন্যধারে ব্যাঘ্রমূর্ত্তি সংস্থাপিত। সিংহদ্বারের দুই পাশের কোঠার দ্বারবান ও পাঁড়ে ঠাকুরদের থাকিবার স্থান। কাছারী বাড়ীতে চারি খানা সুরম্য কুঠরি। তার একখানায় রায়মহাশয় প্রজাদের বিচার করেন; একখানায় বৈঠকখানা। বৈঠকখানার চারিদিকে বিবিধ প্রকার সুরঞ্জিত কৌচ—গালিচা পাতা। মধ্যস্থলে, একটী বৃহদায়তন শ্বেতপ্রস্তরবিনির্ম্মিত টেবিল।

টেবিলের চারিদিকে কয়েকখানা নূতন চেয়ার। এবং দেয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি লটকান রহিয়াছে। আর একখানায় আফিস গৃহ। এখানে জমীদারী সংক্রান্ত যাবতীয় লেখা পড়া হইয়া থাকে। চতুর্থ কুঠিতে তেজারতি সংক্রান্ত কার্য্যকর্ম্ম হইয়া থাকে। এখানে দিবারাত্র অত্যন্ত ভিড়। সর্ব্বদা টাকার ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ শব্দ ; হুকার গুড়্ গুড়্ শব্দ ; তামাক দে, পান দে, ইত্যাদি শব্দে, এ মহল পরিপূর্ণ। কেহ টাকা নিয়া যাইতেছে ; কেহ টাকা গণিয়া জমা দিতেছে ; কেহ বা থলে হাতে করিয়া, টাকা নিতে আসিয়াছে। খাজাঞ্চী মণ্ডল মহাশয়, নিঃশব্দে লেখনী চালনা করিতেছেন। বড় বড় খাতা, বাক্সের উপর রাখিয়া নীলমণি পেস্কারের নামে ৫০০০০৲ টাকা জমা করিতেছেন, গোবর্দ্ধন শঙ্খচূড়ামণির নামে নোটের নম্বর লিখিয়া ৩০০০০৲ টাকা খরচ লিখিতেছেন। গুজারতের "গু" লিখিতে লিখিতে গলদ ঘর্ম্ম হইতেছেন। এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীদের প্রতি ভ্রূকুটি করিতেছেন। চন্দ্রচূড় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, হাণ্ডনোটে টাকা নিতে আসিয়াছেন। কর্ম্মচারীদের মধ্যে ঘোষাল মহাশয়, দে.মহাশয়, "তহবির" নিমিত্ত চাটুর্য্যে মহাশয়ের সঙ্গের গোমস্তাকে খোসামোদ করিতেছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন, তিনি অত্যন্ত ভদ্র লোক, কিছু দিবেনই। মুখুর্য্যে মহাশয় বলিতেছেন, আমরা এসব লোকের নিকটই দু দশ টাকা পাইয়া থাকি। ঘোষ

মহাশয় বলিতেছেন, চাটুর্য্যে মহাশয়ের যে প্রকার প্রশস্ত অন্তঃকরণ; তাতে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি ইত্যাদি কৌশলবাক্যে চাটুর্য্যে মহাশয়ের মাথা ঘুরাইয়া দিতেছে। তিনিও কিছু না দিয়া যাইতে পারিতেছেন না। এত খোসামোদের পরও ঘোষাল মহাশয়, কর্জ্জবার্বীর উডানী ধরিয়াই আছেন। এবং বলিতেছেন, "দেখুন আর পাঁচটি টাকা দিলেই আমরা মহাসন্তুষ্ট হইব। আমরা সংখ্যায় এক পরিবার তুল্য।" অর্থ পাইলে সকলেই সন্তুষ্ট।

তৃতীয় মহল—দুর্গাবাড়ী। এখানে দোল দুর্গোৎসব, বার মাসের বার ক্রিয়া হইয়া থাকে। এ মহলের সংযুক্তই অতিথিশালা। অতিথিশালায় অতিথিদের গান বাজনা, হাস্য পরিহাস, গাজার ধূম্‌ধাম্ অষ্টপ্রহর সমভাবে চলিতেছে।

এর পরের মহল—অন্দর বাড়ী। এখানে অনেকগুলি দ্বিতল গৃহ। তার একটীতে রায় মহাশয়, একটীতে নরেন্দ্রনাথ শয়ন করিয়া থাকেন। আর কতকগুলি গৃহ, মূল্যবান গৃহ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। অন্দর মহলের পর আর একটী মহল আছে। সেই মহলে আগন্তুক আত্মীয় কুটুম্ব ও দাসীরা থাকে। প্রত্যেক বাড়ীতে মেয়ে লোকের যাতায়তের নিমিত্ত, ভিন্ন ভিন্ন সুরক্ষিত পথ আছে। যেমন প্রকাণ্ড বাড়ী, তেমনি প্রকাণ্ড প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। রায়মহাশয়, এসব যে কত টাকা ব্যয় করিয়া করিয়াছেন, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে না।

রায় মহাশয়, শয়নার্থ গৃহে আসিয়াছেন। দেখিলেন, গিন্নী শয়নকক্ষে নাই। কাজেই কর্ত্তার মন ভাল লাগিল না, অত্যন্ত বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। আবদ্ধ পাখীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। জমিদার বাবু তখন কপট অভিমান করিলেন। মনস্থ, গিন্নীকে জব্দ করিবেন। আর যেন কখন ও গোঁপে না আসেন। এই মনস্থে, পালঙ্কোপরি বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন। কিছুকাল পর, গিন্নী ত কার্য্যান্তর হইতে শয়নমন্দিরে আসিলেন। আসিয়া কর্ত্তার যে ভাব অবলোকন করিলেন, তাহাতে গিন্নী, রায় মহাশয়ের কপট অভিমান অতি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। কাজেই, কর্ত্তার হাসি ও কথা বাহির করিবার নিমিত্ত, সহাস্যে বলিলেন,

"গাছের পাতাটি ন'ড়ে না, সংসারে বাতাস মাত্র নেই তবু ও তুফান ? একি রকম ?"

কর্ত্তা, নীরব,—নিশ্চল।

গিন্নী, প্রত্যুত্তর না পাইয়া নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন। বলিলেন,

"যে ঝড়! এখানে আর দাঁড়াতে পারিলাম না। যাই, অন্য ঘরে যাই—"

এই বলিয়া, গিন্নী, গমনোদ্যতা হইলেন। এবং দুই চারি পা হাঁটিলেন ও।

কর্ত্তা তখন বিষম বিপদে পড়িলেন। গিন্নী, চলিয়া গেলে

হৃদয়ে আরও অসন্তোষ জন্মিবে,—অশান্তির হিল্লোল বহিবে। তাই গিন্নীকে যাইতে দেখিয়া, অভিমান ত্যাগ করিলেন। বলিলেন,

"আর যেয়ে কাজ নেই।"

কর্ত্তা, আপন মান আপনি নষ্ট করিলেন। গিন্নীর চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। কাজেই, কর্ত্তার কথা বাহির করিতে, গিন্নীকে আর কোনও ক্লেশ পাইতে হইল না।

তখন গৃহিণী, আসিয়া রায়মহাশয়ের সম্মুখে বসিলেন। এবং নরেন্দ্রনাথের বিবাহের কথা তুলিলেন। রায়-মহাশয়ের একমাত্র পুত্র—নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রকে এখন অনেকেই চিনিয়াছেন। অন্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। শ্বশুর বাড়ী ভাল হওয়া চাই। নরেন্দ্র, দুই চারি দিন থাকিলে, যেন কোন কষ্ট না হয়। বৌটি রূপে নধর নধর করিতে থাকিবে। গিন্নী, কর্ত্তাকে নিজের ঈষৎ খাঁদা নাক দেখাইয়া বলিলেন যে, বৌর নাকও যেন ঐ প্রকারই হয়। গিন্নীর রূপ, পাকা চাঁপাকলার তুল্য। অঙ্গ সৌষ্ঠবও প্রীতিপদ। দোষের মধ্যে কেবল নাসিকাটি খাঁদা ও চক্ষু দুটি ছোট। রায় মহাশয় কিন্তু এতেই বিমুগ্ধ। গিন্নীও ঐ প্রকার চক্ষুই সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করিলেন। কর্ত্তা, সত্যের অপলাপ বা অপমান করিলেন না। বরং রহস্যচ্ছলে কিছু বাড়াইয়া কহিলেন,

"তোমার মতন খাঁদা নাক ও কোটর চক্ষু বৌ এনে, শেষে কি আমার মতন, ছেলের মন ভাঙ্গিব ? তা আমি কখনও পারিব না।"

কর্ত্তার কথা শুনিয়া, গিন্নী, গাল ভারী করিলেন। নত খুঁটিতে খুঁটিতে কহিলেন,

"এত ঠাট্টা কেন ? আমার চোক নাক অপছন্দের নাকি ? অপছন্দের হ'লে বিবাহ না করিলেই হইত। দেখ্‌ব, দেখ্‌ব, আমার মতন কেমন বৌ পাও! তা আর পেতে হবে না। আমিও মরিব না। এখানে ব'সে ব'সে সকলি দেখিব।"

মেয়ে লোকের যত রাগ স্বামীর নিকট। রায়মহাশয়, সহাস্যে কহিলেন,

"তুমি রাগই কর, আর যাই কর, তোমার চেয়ে সুন্দর বৌ না পাইলে, নারানের বিবাহও দিব না।"

গিন্নী, একটুকু অহঙ্কারের সহিত বলিলেন,

"যত দেখ ধুম্ ধাম্।
কার্য্য কালে,
সেই রাম, সেই রাম॥"

কর্ত্তা, গিন্নীর শ্লোক শুনিয়া, মনে মনে হাসিলেন। কহিলেন,

"তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার চেয়ে সুন্দর নাক ও ভাসা ভাসা ডাগর চোখ দেখে বৌ আনিব।"

গিন্নীর রাগ নরম পড়িল। কহিলেন,

"বর্ণটি কেমন আনিবেন ?"

কর্ত্তা। তোমার চেয়ে ভাল পাইলে, আর খারাপ খুঁজিব না।

গিন্নী, নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। কহিলেন,

"কেন ? আমার বর্ণ মন্দ নাকি ?"

কর্ত্তা, এবার গিন্নীর মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন। কহিলেন,

"বর্ণ এর চেয়ে বড় ভাল পাওয়া যায় না। তবে যদি নরেন্দ্রের ভাগ্যে ঘটে।"

গিন্নীও এবার কিছু আহ্লাদিত হইলেন। কহিলেন,

"দেখা যাবে কেমন বৌ আসে।"

এই বলিয়া, গিন্নী, খাবার যোগাড়ে গেলেন।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নদীজলে।

আকাশে পা টিপিয়া টিপিযা চাঁদ উঠিতেছে। চাঁদ, সোণার বশি হাতে কবিযা, সন্ধ্যার রঙ্গমঞ্চ হইতে আঁধাবের যবনিকাখানি ধীবে ধীবে উঠাইতেছে—দর্শকেব প্রাণে ধীবে ধীবে আমোদেব লহবী ছুটিতেছে—খেলিতেছে। বঙ্গমঞ্চে আজ আব লোক ধবে না—আজ "কবিব বিযে" অভিনীত হইবে। স্বয়ং "অর্দ্ধেন্দু" আজ ঘটক। গোধূলি লগ্নের (*Candle light*) আব বেশী বাকী নাই। পঙ্গপালেব মত দর্শকেবা আসিযা যুটিতেছে—ভাল ভাল আসন সময় থাকিতে দখল করিতেছে।

বিটপী বাবুবা ফুলেব তোড়া হাতে কবিয়া বিশেষ আসনে শ্যামল মখমলের কোচে বসিয়াছিলেন। এবাব তাহাবা পাতাব রুমাল দিয়া মুখ-মণ্ডলগুলি মাজিয়া ঘাষিয়া নিলেন। লতিকা সুন্দরীরা হরিত-চিকেব আড়ালে

থাকিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিলেন। দুই একটী লতিকা বড় প্রগল্‌ভা,—তাহারা চিকের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া, সুনীল সরোবরে পদ্মফুল ফুটাইতে লাগিলেন। যবনিকা ক্রমশ ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। গ্যালারির বিহঙ্গ বেচারীদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। গ্যালারির মধ্যে কাকের সংখ্যাই অধিক, তাই অবিরত কলকণ্ঠের কোলাহলে থিয়েটার হল্ নিনাদিত হইতে লাগিল। গ্যালারিতে মাঝে মাঝে শাপভ্রষ্ট দুই চারিটী শ্যামা আসিয়া আশ্রয় নিয়াছিল, তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব জানাইবার জন্য সিসের কারদানি করিতে লাগিল। গ্যালারি গুল্‌জার হইয়া উঠিল।

আর সহ্য হয়না—বড় গৌণ হইয়া চলিল—"লগ্ন" উত্তীর্ণ হইয়া যায়। "ওগো বিয়ের বাজ্‌না বাজাও"—বঙ্গভূমির দর্শকগুলি ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া উঠিল। এবার চাঁদ খুব্ একদোম্ রশ্মি টানিলেন, ঝিঁঝিঁর দল অমনি একতান বাদ্য বাজাইতে লাগিল।

"চুপ্ চুপ্" এখনি অভিনয় আরম্ভ হইবে। ঐ শুভ্র জলদাসনে সন্ধ্যার রঙ্গমঞ্চে রোহিণী সখিগণের সমভিব্যাহারে গগন-উদ্যানে বিচরণ করিতেছেন। কবি চকোরের ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া এদিক্ ওদিক্ ছুটিতেছেন—মাঝে মাঝে কল্পনার চাবুক্ দিয়া অশ্বিনীকুমারকে প্রহার করিতেছেন—(নেপথ্যে)—"ও কবি মহাশয়, পালাও—

পালাও, জলদ তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। ঐ শোন তার হাঁক্ ডাক্—পালাও—শীঘ্র পালাও"। কবি, চকোর-ঘোড়া তাড়াতাড়ি অবনী অভিমুখে ছুটাইলেন। জলদ, নাছোড়বান্দা, বিদ্যুতের অসি নিয়া—বজ্রের গদা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া—চকোরের পাছে পাছে ছুটিলেন—চাতকে চড়িয়া।

অভিনয় থামিয়া গেল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, সে রজনীতে বিটপী বাবুর দল বড় নাস্তনাবুদ হইয়াছিলেন—লতিকা সুন্দরীদের ত কথাই নাই। তাঁহারা সে দিন সারারাত্ মান-মন্দিরে যাপন করিয়াছিলেন—আর গ্যালারি।——সে কথায় কাজ কি?

"কবির বিয়ে" হইল না। এই দুর্যোগে সুশিক্ষিতা অভিনেত্রী শুক-কুমারী দত্ত উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তাই আজ অভিনয় বন্ধ থাকিল। কবি কুমার হইয়াই থাকুন্।

আকাশের মেঘ আকাশে মিশিয়া গেল। ঝড়, দুই চারি বার দন্ত কড় মড়্ করিয়া, প্রকাণ্ড দৈত্যের মত কোথায় চলিয়া গেল। দৈত্যের হৃদয়ে দয়া মায়া নাই, চোখে অশ্রুজল নাই, আছে কেবল, বিদ্বেষের বিদ্যুৎ-বহ্নি—শ্মশানের শ্বাস। তাই বসুমতীর প্রাণ শীতল হইল না। কেবল ধান্যের শ্যামলসাগর, ক্ষণেকের তরে সংক্ষোভিত হইয়াছিল। সোণার মুকুট হইতে চুণীমণিগুলি চতুর্দ্দিকে

কে ছড়াইয়া দিল? কৃষকের সোণার রাজ্যে মহাবিপ্লব হইয়া গেল।

এই মহাদুর্যোগের পর, আবার মিটি মিটি করিয়া, তারা জ্বলিল। একখানা কনকের ধেনু নীল পটে কে আঁকিয়া রাখিল? ধনুতে এখনও কিরণের কোমল মধুর বাণ গুলি আরোপিত হয় নাই। তবুও কাল মেঘগুলি বাণের ভয়ে, প্রাণ হাতে লইয়া পলাইতে লাগিল।

রাত্রি দণ্ড চারি হইয়াছে। বৈশাখের রাত্রি, বড় স্নিগ্ধ, বড় মধুর; তাতে একটু ঝিরি ঝিরি লাগিয়াছে—একটু আলো ফুটিয়াছে, কত সুন্দর, কত মনোহর।

ইছামতীর দুই তীর, শ্যামল তৃণে পরিপূর্ণ। লতা-গুল্মে আচ্ছাদিত; স্থানে স্থানে বেতস লতার কুঞ্জ, কোথায়ও বা দু একটী কণ্টকী বৃক্ষ, তিন্তিড়ি, খর্জ্জুর, বট ও অশ্বত্থের শাখা, ইছামতীর কাল জল চুম্বন করিবার জন্য যেন নত হইয়া পড়িয়াছে। কুশ-তৃণের শ্রেণী, সেই জলে আকণ্ঠ ডুবাইয়া, চাঁদের কিরণ পান করিতেছে। কোথাও গ্রামবাসীদের ঘাট, মাটি কাটিয়া, সোপান বাঁধিয়া, ঘাট করা হইয়াছে। এই ঘাটের অনতিদূরে, একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরের হক মালিক, শ্রীরামভদ্র। রামভদ্র, এই ঘাটে আসিয়া, প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করে। রামভদ্রের কুটীরে দুইটি পালিতা শিশুর (এখন রমণী বলিলেই হয়।) সহিত পাঠকের পরিচয় করাইয়া

দিতেছি। শৈলবালার সহিত ইন্দুমতী, একত্রে লালিত পালিত হইযাছে। শৈলবালা, সন্ধ্যার সময়, ইন্দুমতীকে নিয়া, প্রত্যহ ঘাটে স্নান করিতে আইসে। ঝড় তুফানের নিমিত্ত, আজ ঘাটে আসিতে, কিছু বিলম্ব হইল।

এখন ঝড় তুফানের হাঙ্গামা আর নাই। শৈলবালা, ইন্দুমতীকে লইয়া, ধীরে ধীরে গান গাইতে গাইতে, নদীজলে যাইতেছে। শৈলবালা, বড় গান-ভক্ত। তাহার গানের বড় একটা অর্থ হইত না। একটা কিছু হাতে পাইলেই, গলা সাধিয়া গান ধরিত। পুষি বিড়ালকে নিয়া, নানা ছন্দে গীত রচনা করিত। কখন গাইত,

ওরে আমার পুষি!
তোরে মাছের শিরে, দুধের সরে
আদর করে পুষি!
আজ যে একাদশী,
নিরামিষ খেলে খাবি, নৈলে যাবি
যেখানে তোর খুসি।

কখনও রামভদ্রের টাক্‌পড়া মাথা স্মরণ করিয়া গাইত,—

চর পড়েছে মাথে—ওগো,
চরের নাম যে টাক্;
চার ধারেতে সাদা জল
মাঝখানেতে ফাঁক্।

এদিকে নরেন্দ্রনাথ, বকুল তলায় রামভদ্রের সহিত কথোপকথন করিয়া, উদ্ভ্রান্ত-মানসে চলিতেছিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহার শ্রবণ বেলায়, একটী সুস্বর লহরী, চুম্বন করিল। নরেন্দ্রনাথ তখন যেন মদিরা বিহ্বল হইয়া পড়িল। সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। স্বর-তরঙ্গ, এবার শ্রবণ বিবরে আসিয়া আঘাত করিল। শুধু আঘাত নয়, ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। স্বর এবার গানে পরিণত হইল। স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর শ্রুত হইতে লাগিল। শুনিল,—

এসো বধূ এসো নিকুঞ্জকাননে।
হেরিবে শ্রীরাধা ভরিয়ে নয়ন॥
তুয়া সম কোন জন, নাহি বলে ত্রিভুবন,
রাধাকান্ত তুমি শ্যাম এ বিপিনে।
রাধার ভাঙ্গা কুটীর, তাহে যমুনার তীর,
বসি বিথারি তুষিবে তুয়া ধনে॥

শৈলবালা, এ গানটি বৈষ্ণবীদিগের নিকট শিখিয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ, আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। গান যেন মূর্ত্তিমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পরে, সম্মুখে দেখিল, দুইটি সঙ্গীত-তরঙ্গ গলা বাঁধিয়া যেন তীরদেশে আসিয়াছে। নদীর জলে, সেই সঙ্গীতের ছায়া পড়িয়াছে; চাঁদের কিরণে সঙ্গীত-তরঙ্গ দুটি উজলি উজলি হাসিতেছে।

বন, উপবন, আকাশ সঙ্গীতে যেন ডুবিয়া গিয়াছে। নরেন্দ্রনাথের হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। শৈলবালা, ইন্দুমতীকে বলিয়া উঠিল। বলিল,

"রাত্রি হইয়াছে, চল ঘরে যাই।"

নরেন্দ্রনাথ, সবিস্ময়ে দেখিলেন, এ সঙ্গীত নয়,—দুটী রূপবতী রমণী। জলে পা ডুবাইয়া, পৃষ্ঠে আর্দ্র কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশগুচ্ছের ভার ছড়াইয়া বসিয়া আছে। নরেন্দ্রনাথ ভাবিল, এ জলদেবী, না মানবী? মানবীর কি এরূপ দেবোপম রূপলাবণ্য হয়? ঐ পদ্মপলাশলোচন যুগল, ঐ অনিন্দ্য চাঁদপানা মুখকমল, ঐ অতসী পুষ্পবিনিন্দিত বরণ, কত যে লোকললাম, কত যে আঁখি-তৃষ্ণাবদ্ধক, কে তাহা নির্ণয় করিবে? নিশ্চয় এ সাগরবালা। রত্নাকর ভিন্ন রতন আর কোথায় পাওয়া যায়? রতন, সাগরে জন্মে কেন?

নরেন্দ্রনাথ, এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়, শৈলবালা ও ইন্দুমতী, ধীরে ধীরে জল হইতে উঠিয়া, গৃহাভিমুখে চলিল। তখন, নরেন্দ্রনাথের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল এবং নিরাশার প্রকম্পনে হৃদয় দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। নিভৃত প্রাণের শান্তিপ্রদ সুখের ধনকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, অনিমিষ ও প্রীতি বিস্ফারিত লোচনে রমণীদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল চলিতে চলিতে, শৈলবালা, ইন্দুমতীকে কহিল,

"সই, আর বুঝি অধিক দিন এমন করিয়া স্নান করিতে পারিবে না ?"

ইন্দু। কেন, সই ?

শৈল। জলেতে কুমীর এসেছে।

ইন্দু। এ আবার কোন রঙ্গ, সই ?

শৈলবালা, হাসিয়া গান ধরিল। গাহিল,—

যাব না কালিন্দী জলে,
কালা দাঁড়ায়ে কদম তলে।

গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সম্বন্ধ।

এই সব ঘটনার পর হইতে, নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীর কুটীরে আসা যাওয়া করিতে লাগিল। ক্রমশ তাহাদের ভিতরে ভিতরে বেশ একটু প্রণয়ও জন্মিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীকে দেখিয়া যাইয়া, বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে থাকে। ভাবে, এ রত্ন পাইলে, না জানি কত সুখ হইবে? কতবার দেখিয়াছি, এখনও কতবার দেখিতেছি, তথাপি সেই চাঁদপানা মুখখানি দেখিতেই ইচ্ছা হয়। কেন যে হয়, বলিতে পারি না। এ সংসারে কত নয়নরঞ্জন রমণীয় বস্তু দেখিতেছি,—দেখিয়া ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছি। কোন বস্তু দেখিয়াই ত হৃদয়ে কষ্ট হয় না। বরং কমনীয় পদার্থ অবলোকন করিলে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব অতুলানন্দ জন্মে। কিন্তু, ইন্দুমতীর শুভ্রসরোজোপম মুখমণ্ডলের কোমল হাসিতে প্রাণে ব্যথা পাই কেন? আর যখন সেই মধুর হাসি বিলোকন করি,

তখনি বা আত্মবিভ্রম জন্মে কেন? সেই হাসি, সেই বসন্ত-প্রফুল্ল-কুসুমবৎ সুন্দর হাসি দেখিয়া, এখনও প্রাণে প্রাণে জ্বলিতেছি কেন? ইন্দুমতীর সেই সুন্দর মুখের কথা মনে পড়িলে, প্রাণের ভিতর উদাস বায়ু উত্থ করিয়া প্রবাহিত হয় কেন? এ বন প্রসূন। আমি গলে পরিতে পারিব কেন? বনফুল, আপনি ফুটে, আপনি আবার ভগবানের পাদপদ্মে ঝরিয়া পড়ে। কে তাহার অন্বেষণ করে? আমি দেখিয়াছি—প্রাণ হারাইয়াছি। কেন দেখিলাম? কেন প্রাণ দিতে গেলাম? রামভদ্র, আমাকে কেন এ প্রলোভনপূর্ণ কূপসাগরে নিক্ষেপ করিল? রামভদ্র, অসম্ভব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। তবে আমার উপায় হবে কি? ধিকি! আমি এ সমস্ত ভাবি কি? আমি কি পুরুষ? আমার পুরুষত্ব কোথায়? ইন্দুমতী আমার কে? আমি তাহার জন্য ভাবি কেন? সে বনের ফুল, বনেই থাকিবে। বনফুল, মানবের উপযুক্ত নহে। মানব, সে সব ফুল ভালবাসে না। আবার নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীর কাছ হইতে সরিয়া গেলে, ইন্দুমতীও কত ভাবিতে ভাবিতে, কত আকুল হয়। সেও ভাবে, ফুল ফুটে, চাঁদ হাসে, তাতে মানুষ মাতে কেন? ফুলের সুবাস, নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রাণ ব্যাকুল করে; সেটি কি মানুষের দোষ? আমার প্রাণ, অনলে ঝাঁপ দিতে চাহে—পুড়িয়া মরিবার ভয় করে না, তখন চিত্ত

বশে রাখি কেমনে? মুখ বাঁধা যায়, কিন্তু, মন বাঁধা যায় না। শৈল, ইহা বুঝে না। কেবল, আমাকে বিদ্রূপ করে।

রামভদ্রও স্বচক্ষে, এই প্রণয় ঘটিত আচরণ অবলোকন করিল। দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, ইন্দুমতীর যৌবন গাঙ্গে জোয়ার বহিয়াছে—প্রবল পূর্ণ বেগে। এখন আর বারির বাঁধ মানিবে না। ইন্দুমতীকে, বড় ভালবাসি। এ বয়সে আর ঘরে রাখা যায় না। উচিতও নয়। এখন সুপাত্রে অর্পণ করাই যুক্তিসঙ্গত। পাত্রটি মিলিয়াছেও ভাল, শান্ত, সুধীর, কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। দেখিতেও পরম সুশ্রী, যেন কার্ত্তিকের ন্যায়। বিষয় বিভবের ত কথাই নাই, যেন কুবের-ভাণ্ডার। ইহার চেয়ে সুপাত্র আর কি হইতে পারে?

এই সমস্ত ভাবিয়া, রামভদ্র, একদিন নরেন্দ্রনাথের পিতার নিকট উপস্থিত হইল এবং বিবাহের প্রস্তাব করিল। রায়মহাশয়, শুনিয়াই প্রথমে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন, "মেয়ের পিতা মাতা নাই, আত্মীয় স্বজন কেহ নাই; ছেলে শ্বশুর বাড়ী যাইয়া, দুই চারি দিন থাকিতে পারিবে না। বিশেষত সামাজিক প্রথাই বা কি প্রকারে অবহেলা করি? মেয়ে কোন কুলের তাহারও নিশ্চয় নাই।" এই সমস্ত কথার প্রত্যুত্তরে, রামভদ্র, নরেন্দ্রনাথ ঘটিত সমস্ত কথা; ইন্দুমতীর অনিন্দ্যসুন্দর শারদীয় পূর্ণচন্দ্রতুল্যমুখমণ্ডল; সুশ্রী অঙ্গ সৌষ্ঠব; উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রভৃতি অনেককথা, সুন্দরভাবে

সাজাইয়া বলিল এবং ইহাও বলিল, যে ভুকুলপুরে একবার মহামারী উপস্থিত হয়। সেই সময়, শত শত লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। অনেকেই গ্রাম ছাড়িয়া যাইয়া, জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু, ধরণীধর বাবু, সপরিবারে গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াও বাঁচিতে পারিলেন না। পথিমধ্যে ধরণীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। রামভদ্র, বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিল। মৃত্যুকালে, ধরণী বাবু আমাকে বলিলেন, "রামভদ্র, তুমি আমার ভৃত্য হইলেও এখন রক্ষাকর্ত্তা। তুমি আমার কন্যা ও রাম বাবুর (রাম বাবু, ধরণী বাবুর বন্ধু ও প্রতিবাসী ছিলেন। তিনিও মহামারীতে সবংশে নির্ব্বংশ হইয়াছেন।) কন্যাকে জীবিত কাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিও। এ ঋণ আমি শোধ করিতে পারিব না।" সেই হইতে ভুকুলপুর গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়া, কন্যাদ্বয়কে নিয়া আপনার আশ্রয়ে বাস করিতেছি। কন্যা দুটি, যে সংকুলের, রামভদ্র, তাহারও অনেক নিদর্শন দিল।

তখন রামমহাশয়, কিছু নরম হইলেন। অনেক দিন যাবৎই সুন্দরী কন্যা খুঁজিতেছিলেন; কিন্তু, কোথায়ও মনের মতন পরমা সুন্দরী কন্যা ঘটাইতে পারেন নাই। এখন রামভদ্রের মুখে, ইন্দুমতীর রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া, দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। স্থির করিলেন, কন্যা দেখিয়া মতামত বলিবেন। কর্ত্তার কথায়, রামভদ্রের মনে

কিছু ভরসা হইল। ভাবিল, রূপ দেখিয়া করিতে হইলে, এমন সুশ্রী কন্যা আর পাইবে না। ঠিক হইল, পরদিন রায়মহাশয়, ইন্দুমতীকে দেখিতে যাইবেন।

বস্তুত, পরদিন রায়মহাশয়, গৃহিণীকে না বলিয়াই, গোপনে কন্যা দেখিয়া আসিলেন। ইন্দুমতীর লোকললাম রূপলাবণ্য দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। স্থির করিলেন, ইন্দুমতীকেই পুত্রবধূ করিবেন। কেবল, গিন্নীকে একবার জিজ্ঞাসা করিবেন মাত্র। তাই, রাত্রিতে গিন্নীকে কহিলেন,

"দেখ, বৌটি যদি খুব সুন্দরী হয়; অবশ্য তোমার নাক চোকের ন্যায় নহে! তিলফুল তুল্য নাসিকা, পদ্মপলাশ তুল্য চক্ষু, ঠোঁট দুটি খুব পাতলা, দন্তপাঁতি মুক্তার ন্যায; তবে তুমি সেই বৌ গৃহে আন কিনা?"

গিন্নী, মনে মনে ভাবিলেন, আজিও বুঝি, সেদিনের ন্যায ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিবেন। তাই এত কথা। প্রকাশ্যে কহিলেন,

"আজিও আবার ঠাট্টা নাকি?"

কর্ত্তা, বড়ই হর্ষের সহিত কহিলেন,

"না। সত্যই অমন বৌ দেখে এসেছি।"

গিন্নী। ভাল। দেখে এসে থাকেন ত তেমন বৌ আনিলেই হয়।

কর্ত্তা। ছেলে কিন্তু শ্বশুর বাড়ী যাইতে পারিবে না। এ বৌ বনে ফুটেছে।

গিন্নী। তা হউক গিয়ে। বাবাব আমাব কি খাবার পবিবাব অভাব? বৌটি লক্ষ্মীশ্রী হ'লেই হ'ল। কোথায় এমন বৌ দেখে এলেন?

কর্ত্তা। নিকটেই।

তখন কর্ত্তা গিন্নীতে নবেন্দ্রনাথেব বিবাহ সম্বন্ধে নানা প্রকাব কথোপকথন চলিতে লাগিল।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—::—

বিবাহ।

বুধবার, নরেন্দ্রনাথের বিবাহ। অদ্য সোমবার, মাঝে একদিন মাত্র আছে। ইহার ভিতর আত্মীয় কুটুম্বে, রায়বাড়ীর বাহির ও অন্দর মহল, পরিপূর্ণ হইয়াছে। আজ হইতে দশদিন পর্য্যন্ত নাচ গান, আমোদ প্রমোদ হইবেক।

বাহির বাড়ী, দুর্গাবাড়ী, নাটমন্দির, নাচঘর প্রভৃতি বিশেষ পারিপাট্যে সাজান হইয়াছে। নাচ ঘরের প্রত্যেক দুই থামের মাঝে, ছোট ছোট আট ডালের ঝাড়; এবং প্রত্যেক থামের গায়ে, যুগ্ম দেওয়ালগিরি। থামের প্রায় অগ্রভাগে সুন্দর সুন্দর স্বর্ণরঞ্জিত ফ্রেম সংযুক্ত সুদৃশ্য ছবি। ঘরের মধ্যস্থলে একটী বৈদ্যুতিক আলো, আলোটির দুই পার্শ্বে দুটি চব্বিশ ডালের ঝাড়,—আলোতে পরিপূর্ণ।

নাচঘরটি দিবামর বলিয়া প্রতীত হইতেছে। রোসনাইর বন্দোবস্ত প্রচুর।

বসিবার বন্দোবস্তও প্রীতিপ্রদ। সতরঞ্চের উপর অতি ফরসা চাদর পাতা। নাচ গানের প্রচুর জায়গা রাখিয়া, উভয় পার্শ্বে একই রকম ভূজশূন্য চেয়ার। চেয়ারগুলির মাঝে মাঝে দুই একখানা কৌচ ও গালিচা পাতা। উত্তর ও দক্ষিণের থামের সংলগ্ন করিয়া; শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত দুখানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেবিল রাখা হইয়াছে। টেবিলের উপর সোণার আতরদান, গোলাপপাশ, পানের ডিবা প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে। সদর রাস্তার অগ্রভাগে অভ্রভেদী নহবত। নহবতের চূড়াতে ঝগ্‌ঝগার প্রকাণ্ড গরুড়পাখী,—দুইপক্ষ বিস্তার করিয়া যেন উড়িবার যোগাড় করিতেছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে আলো শ্রেণী—নক্ষত্র শ্রেণীর ন্যায় জ্বলিতেছে। আবার রাস্তার উভয় পার্শ্বে, কাগজের বিচিত্র বিবিধ প্রকার ছবি ও পতাকা। পতাকাগুলি পত্‌ পত্‌ করিয়া বায়ুভরে দুলিতেছে।

এ সমস্ত দেখিতে দেশীয় বিদেশীয় লোক দলে দলে আসিতেছে—দেখিতেছে—যাইতেছে। কোন কোন ছবি দেখিয়া, কেহ হাসিতেছে, কেহ কেহ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকে লোকারণ্য;• এত লোক। তামাসাও প্রচুর—নাচগান, থিয়েটার, যাত্রা, সার্কাস, ছায়াবাজী ও পুতুল নাচ। এ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

অভিনয় হইতেছে। সকল বিষয়েই সুচারু বন্দোবস্ত। এত যে লোকের ঠেসাঠেসি মেশামেশি, তথাপি কাহারও দেখিবার আপত্তি নাই। যাহার যেখানে দেখিবার অভিপ্রায় হইতেছে, সে সেইখানেই দেখিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া, সকলে রায়মহাশয়কে যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছে। এই প্রকার ত হইয়াছে, বাহির বাড়ীর ব্যাপার। এখন অন্দর মহলের ব্যাপার দেখিলে হয় না?

অন্দর মহলেও খুব জাঁক। গিন্নী, তাঁহার লতার পাতার সংশ্রবের আত্মীয় কুটুম্ব আনিয়াছেন। পিসীর মাসীকে এবং তাহার শাশুড়ীর বেয়ান, বেয়ানের সঙ্গে আসিয়াছে— সাত ছেলে, পাঁচ নাতি ও ছয় নাতিন্। আরও আসিয়াছে, —মামা শ্বশুরের শালার ঘরে, একটী স্ত্রীলোক থাকেন; সেই রমণী, তাহার দুটি অবিবাহিতা কন্যা, তিনটি পুত্রবধূ, ও একটী ছোট ছেলে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে কেহই বাকী নাই, সকলেই আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রথমে আসিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; গিন্নী, তাহাদিগকেও সাতবার করিয়া, পাল্কী পাঠাইয়া মাথার দিব্য দিয়া আনাইয়াছেন। গিন্নীর শৈশব সহচরী, একদিন গিন্নীকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, যে তোমার ছেলের বিবাহে আমি তোমাদের বাড়ী যাইব। গিন্নী সেই সইকে বৰ্দ্ধমান হইতে, খরচপত্র দিয়া আনাইয়াছেন। গিন্নীর সই, স্বামীসহ বৰ্দ্ধমানে থাকিতেন।

কারণ, সয়ের স্বামী, বর্দ্ধমান কোর্টের একটি বিখ্যাত উকীল।

যাহাহউক, মঙ্গলবার প্রভাতে উঠিয়া, রমণীগণ, কেহ স্নান করিতে যাইতেছে, কেহ স্নানান্তে অলঙ্কার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিতেছে; মলের ঝণুঝুণু শব্দে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইয়াছে, কেহ বা অলঙ্কার পরিতে না পাইয়া স্বামী-নিন্দা করিতেছে।

গিন্নী, সকলকে প্রভাতের ভোজন করাইতেছেন। রামার মা, শ্যামার পিসী, বামার দিদি, যতীশের শাশুরী, সাতকড়ির জেঠী, তিনকড়ির বৌ, নকড়ির খুড়ী, বৃন্দার শালী, দক্ষিণার মাসী, দিগম্বরের মামি, কানায়ের বেয়ান, রূপার বোণ, সোণার মেয়ে, জগার ঠাকুর মা ও মাধার স্ত্রী প্রভৃতি স্ত্রীলোকগুলি, জিভ্ বাহির করিয়া, কোমরের কাপড় খুলিয়া, লুচি, কচুরী, সন্দেশ ও জিলাপি প্রভৃতি মিঠাই সামগ্রী খাইতেছে। রামার মায়ের পাতে ভুলে “রসগোল্লা” পড়ে নাই, আর সকলের পাতেই পড়িয়াছে। তা দেখিয়া, রামার মা যা হইবার তা ত হ'লই, তারপরও বলিতে লাগিল, “গিন্নীর দেবার শ্রী দেখ।” নকড়ির খুড়ী বড় সেয়ানা মেয়ে। সে গিন্নীর ভুল বুঝিতে পারিল। হাসিয়া রহস্যচ্ছলে রামার মাকে বলিল, ‘এরি ভিতর রসগোল্লাটি খেয়েছিস্; কি হাবাতি গা, তুমি?’ “তোমার মাথা খেয়েছি”, বলিয়া রামার মা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল

এবং নরুডির খুড়ীকে যথেচ্ছ গালাগালি দিতে লাগিল। গিন্নী, এ সংবাদ জানিতে পারিয়া, রামার মাকে বলিয়া কহিয়া, ঝগড়া নিবারণ করিল এবং একটীর বদলে পাঁচটি রসগোল্লা দিল। রামার মা তখন সকলকে দেখাইয়া দেখাইয়া, বেশী পরিমাণে জিভ্ বাহির করিয়া রসগোল্লা-গুলি খাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ত মঙ্গলবার কাটিয়া গেল। আজ বুধবার, বিবাহের দিন। অত্যন্ত ধুম্ ধাম্। বাহির বাড়ীর কোথায়ও নাগ্‌রা, টিকারা, ঢোল, সানাই, কাঁশি বাজিতেছে, কোথায়ও ইংরাজী বেণ্ড বাজিতেছে, দমফলা নাচিতেছে, এবং নহবতে রোসন চৌকি হইতেছে। তুমুল বাদ্যোদ্দামে, গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে। দুপুর আসিল। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত লোক, দলে দলে পিপীলিকার জাঙ্গালের ন্যায় খাইতে আসিতেছে—খাইতেছে—খাইয়া যাইতেছে। এদিকে কাকপালও ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতেছে—বসিতেছে—ডাকিতেছে এবং বন্দুকের শব্দ শুনিয়া উড়িতেছে—বসিতেছে! বাড়ীর কুকুরগুলি, খাইয়া খাইয়া, আর পেটের ভারে চলিতে পারিতেছে না। তথাপি অন্য কুকুরগুলিকে খাইতে দিতেছে না, তাহারা কিন্তু পাকেপ্রকারে খাইতেছে,—আর মারামারি করিতেছে। কোন কোন অতিরিক্ত ভোজী কুকুরের জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া ঝুলিতেছে।

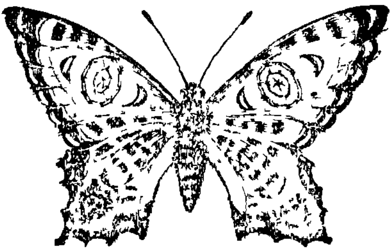
রায়মহাশয়, এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সকলের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এ সকল কার্য্য করিতে করিতে শরীর দিয়া ঘর্ম্ম বাহির হইতেছে। গিন্নী, বাড়ীর ভিতর হইতে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যে কর্ত্তাকে আসিয়া কিছু জলখাবার খাইয়া যাইতে বল। কর্ত্তাও সংবাদ দাতার নিকট বলিয়া দিলেন, "আজ আমি নিরম্বু উপবাস থাকিব, গিন্নীর ক্ষুধা পেয়ে থাকিলে, তাঁহাকে যাইয়া খাইতে বল।" দেওশালী, পাঁড়েঠাকুর প্রভৃতি সকলে লাল বনাতের জামা পেণ্টুন পরিয়াছে; মাথায় শালু কাপড়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়াছে এবং সঙ্গিন সংযুক্ত বন্দুক হাতে করিয়া চারিদিকে ঘুরিতেছে—হাঁক দিতেছে—মাঝে মাঝে বন্দুক ছাড়িতেছে।

দিন কাটিয়া গেল। রাত্রি আসিল। তখন তামাসা দেখিবার নিমিত্ত, একটা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। লোকগুলি, একবার থিয়েটারের কাছে, একবার পুতুল নাচের কাছে, একবার সার্কাসের কাছে আসিতেছে—দেখিতেছে—দেখিয়া আবার যাইতেছে। কেহ কেহ না দেখিতে পারিয়া গোলমাল করিতেছে,—সম্মুখের লোকগুলিকে ঠেলিতেছে—ধাক্কা দিতেছে। কর্ম্মচারী মহাশয়গণ, সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ পরিয়া, গোলমাল নিবারণ করিতেছেন। পাঁড়ে ও দোবেঠাকুরেরাও গোলমাল থামাইবার নিমিত্ত, লোকগুলিকে লাঠির গুঁতা মারিতেছে। কিন্তু, কিছুতেই

গোল নিবারণ হইতেছে না। ববং ইহাতে আরও গোল বাড়িতেছে।

এদিকে রাত্রি দশটার সময়, শুভলগ্নে শুভক্ষণে, নরেন্দ্রনাথের সহিত ইন্দুমতীব বিবাহ হইয়া গেল।

এতদিনে রামভদ্রেব অভিলাষ ও চেষ্টা সফল হইল।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—ঃ**ঃ—

দম্পতি-সম্মিলন।

জ্যোৎস্না রজনী। এখন আর জোছনার বাল-সুলভ চাঞ্চল্য নাই। পূর্ণ যৌবনের পূর্ণবেগ, পূর্ণভাবে পড়িয়াছে। যৌবন-লাবণ্য, বৃক্ষের লতায় পাতায়, ফুলে ফলে নিপতিত হইয়াছে এবং চিক্ মিক্ করিতেছে। রজনী কবরীতে তারার মালা পরিয়াছে। জগত, সুষমায় ঢল ঢল।

প্রায় একমাস অতীত হইল, নরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ পরিষ্কার রজনী দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীর সহিত খিড়কীর বাগানে আসিয়া উপনীত হইল এবং উভয়ে প্রীতি-প্রফুল্লান্তঃকরণে ধীরে ধীরে বেড়াতে আরম্ভ করিল। ভ্রমণ করিতে করিতে ইন্দুমতী, বাগানের রমণীয় শোভা পরিদর্শন করিতে লাগিল। দেখিল, সারি

সারি কতকগুলি পুষ্পবৃক্ষ,—সুন্দর সুন্দর প্রস্ফুটিত ফুল ও মুকুলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ভ্রমর, বড় প্রবঞ্চক। বংশীরবে মত্ত কুরঙ্গের ন্যায়, মধুগন্ধে, এফুলে ওফুলে উড়িতেছে—বসিতেছে। যেন আপনার প্রবল প্রেম-প্রাবল্য জানাইতেছে। ছি! ভ্রমর, তুমি এই প্রকার আচরণ করিও না। কেহই তোমার চাঞ্চল্যভাব ও দংশন যাতনা ভালবাসিতেছে না। কামিনী, হোক্ কোমল কামিনী, তবু সহজে কাহাকেও আপনার প্রাণ দিতে চাহে না। ভ্রমর, কামিনীর কাছে সোহাগ জানাইতে আসিবামাত্র সে ঝাড়া দিয়া বলিল, মুখের সোহাগ চাহি না; প্রবঞ্চক দূর হও। ভ্রমর তখন ভোঁ ভোঁ ভোঁ করিয়া, অভিমানিনী কেতকীর নিকট উপস্থিত হইল। কেতকী, মুখ মলিন করিয়া, কণ্টকাকীর্ণ ঘোমটা টানিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, শঠ, আজ তোমাকে কাঁদাইয়া ছাড়িব। ভ্রমর কিন্তু তাহা বুঝিল না। সে কেতকীর ঘোমটা টানিয়া মুখ দেখিবার জন্য যেই বল প্রয়োগ করিল, অমনি সেই কণ্টকাকীর্ণ ঘোমটায় তাহার বাহু জড়াইয়া গেল। তখন ভ্রমর অস্ফুটস্বরে কেতকীর নিকট কত মিনতি, কত কাঁদিতে লাগিল,—তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া ছুটিয়া পলাইল। নরেন্দ্রনাথ ও ইন্দুমতী, ভ্রমরের লাঞ্ছনা ও মিনতি দেখিয়া হাসিতেছিল।

ইন্দুমতী, হাসিতে হাসিতে কহিল,

"নাথ ফুল ফোটে কেন ?"

নরেন্দ্র। মরিতে।

ইন্দুমতী। তবে এ ঘটায় লাভ কি ?

নরেন্দ্রনাথ, ঈষৎ হাসিল। কহিল

"সকলকে সৌরভ দানই লাভ।"

ইন্দুমতী, এ কথায় আর কিছু না বলিয়া, ফুল তুলিতে চলিল। নরেন্দ্রনাথ, দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, ইন্দুমতীর ফুলতোলা অবলোকন করিতে লাগিল। দেখিল, প্রফুল্লিত পুষ্পবনে যেন স্বর্গীয় কিন্নরী আসিয়া, অতীব যত্নসহকারে ফুল তুলিতেছে। ইন্দুমতী, একখানা কাল চৌড়া ফিতা পাড় কাপড় পরিধান করিয়াছিল, কাপড়ের পাড়টি কোমরের উপর জড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথ ভাবিল, একখানা শুভ্র স্তম্ভের গায় যেন কাল ভুজঙ্গ বেড়িয়া বেড়িয়া উঠিতেছে। আর ইন্দুমতীর শিথিল চলন-ভঙ্গি দেখিয়া ভাবিল, মদোন্মত্ত রতিদেবী যেন কামদেবের চিন্তায় ভগ্ন-হৃদয়ে, ধীরে ধীরে, একটির পর একটী করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে চলিয়াছেন।

ইন্দুমতী, ফুল তুলিয়া, নরেন্দ্রের নিকট আসিল। বলিল,

"এসো, আমরা বসি।"

নরেন্দ্র। কোথায় ?

ইন্দু। কেন ? ঐ তরুতলে।

ইন্দুমতী, সম্মুখস্থ মাধবীলতার গাছটি দেখাইয়া দিল।

তারপর, উভয়ে মাধবীলতার তলদেশে গিয়া বসিল। মাধবীলতার তলাটি বড় সুন্দর। নবঘনশ্যামল তৃণাবৃত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখিলে বোধহয়, একখানা সবুজ বর্ণের কার্পেটের উপর, কেহ যেন মাধবীলতার গাছটি রোপণ করিয়া রাখিয়াছে। ইন্দুমতী, তরুমূলে বসিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীর কোলে মাথা রাখিয়া, শয়ন করিল। পাতার ভিতর দিয়া চাঁদের সুস্নিগ্ধ কিরণ আসিয়া, ইন্দুমতীর মুখমণ্ডলে নিপতিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ, শুইয়া শুইয়া, অনিমিষ লোচনে, ইন্দুমতীর চন্দ্র-কিরণ-বিধৌত-প্রফুল্ল-সরোজোপম-মুখখানি, দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার কতবার আত্ম-বিভ্রম জন্মিল।

ইন্দুমতী, মালা গাঁথিতে গাঁথিতে কাঁদিতে ছিল। কেন কাঁদিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু ইন্দুমতীর অশ্রুকণায় মালার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। ফুলের প্রতি পাপ্‌ড়িতে অশ্রুবিন্দু বিন্দু বিন্দু নিপতিত হওয়ায় মুক্তার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। হঠাৎ একটী উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু, নরেন্দ্রনাথের শরীরে পড়িল। নরেন্দ্রনাথ, চমকিয়া উঠিয়া বসিল। পরে, ব্যগ্রতার সহিত বলিল,

"ইন্দু, একি! কাঁদ্‌ছ কেন?"

ইন্দুমতী, নীরব।

নবেন্দ্রনাথ, পুনবায় কহিল,

"ইন্দু, বল, কি হইযাছে"

ইন্দুমতী, অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। কহিল,

"কৈ? না।"

এই বলিয়া, নবেন্দ্রনাথেব মুখেব দিকে একবাব তৃষিত চাতকেব ন্যায় চাহিয়া, ভুজ পাশে জড়াইয়া ধবিল। নরেন্দ্রনাথ, কহিল,

"ছি। মিথ্যা কথা বলিতে নেই।"

ইন্দুমতী, অপ্রতিভ হইল। মনে মনে অনুতাপ কবিতে লাগিল। ভাবিল, স্বামী পবমদেবতা। দেবতাব কাছে মিথ্যা কথা কহিলে কি নিস্তাবেব পথ আছে? ভাবিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,

"একটী কথা মনে পড়িল।"

নরেন্দ্রনাথ, সমুৎসুক চিত্তে কহিল,

"কি কথা, ইন্দু?"

ইন্দুমতী, বাষ্পাকুলিতলোচনে, কাতবকণ্ঠে কহিল,

"আমি চিবদুঃখিনী; এত বড সুখ পোড়াকপালে টিকিলে হয়।"

ইন্দুমতীব গণ্ড বাহিয়া, একটী অশ্রু ঝবিল, আব একটী ঝবিল। এক, দুই, তিন অনেকগুলি ঝবিল। কুসুম কোরকে আব যেন নীহার ধরে না। কি সুন্দব! দেখিতে বড়ই সাধ হয়। বিধাতা কেন আমাকে অশ্রুময়

করিলেন না? অশ্রুর লীলা হইলেই কি হয়। তেমন প্রশান্ত প্রফুল্লহরিণ-আঁখি দুটি পাওয়া চাই। আবার তেমন ফুটন্ত, কোমল গোলাপী গণ্ডখানি পাওয়া চাই। এককথায়, ইন্দুমতীর লাবণ্য-সমুদ্রে প্রেমের প্লাবন, কোমল বয়ানে, ললিত-লোচনের লীলা—কার না দেখিতে অভিলাষ হয়?

ইন্দুমতী, আমরা জানি, তুমি কাঁদিতে আসিয়াছ। কাঁদিবে, তাতে ভয় কি? জগৎ, যে অশ্রুডোরে বাঁধা।

ইন্দু, আকাশ কাদে, সাগর কাঁদে, পাষাণ কাঁদে, কাঁদিয়াই জগতের শান্তি। অশ্রু না থাকিলে, এ সংসার বাঁচিত না। পাষাণের বুকে ঝরণা আছে বলিয়াই পাষাণ বাচিয়া আছে। উহার হৃদয়াভ্যন্তরে যে দগ্‌দগি, তা তুমি আমি কি বুঝিব? আকাশ সারাদিন জ্বলিয়া মরে, মাঝে মাঝে শ্যামল জলধর আসিয়া সান্ত্বনা করে। সাগরের উদ্বেলিত প্রাণখানি দেখিয়া, মনে করিও না, সাগর উল্লাসে ফাটিয়া পড়িতেছে। সাগরের হৃদয়ে ডুবিয়া দেখ, সেও জ্বলিয়া জ্বলিয়া কাঁদিয়া থাকে। তাহার উপরে নীচে কেবলই জ্বালাতন। সাধে কি সাগর গর্ গর্ করিয়া কাঁদে।

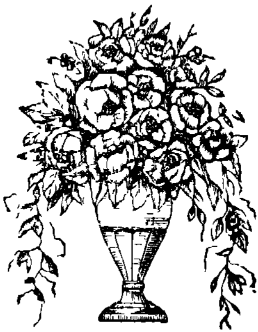
আর তুমি আমিও কাঁদি। আমরা কাঁদিবার সময় জানি। সহানুভূতি দেখাইবার জন্য একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেও পারি। ইন্দু, তুমি যোগিনী, হাসিবে কেন?

হাসি মবিযা যায়। ফুল, মবিবাব জন্যই হাসে, চপলা, মবিবাব জন্যই জ্বলে; শিশিব হাসিযাই মবিযা যায। অতএব ইন্দুমতী,'তুমি কাঁদিও। আমবা তোমাকে জগতের মহাবাণী বলিব।

নবেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীব কপোল বাহিযা যে, অশ্রু পডিতেছিল, তা মুছাইযা দিল। পবে, কহিল,

"ছি। ওসব কথা ভাবিতে নেই।

ইন্দুমতী, আব কিছু বলিল না।



নবম পরিচ্ছেদ।

—*:o:*—

সূত্রপাত।

মানুষের বিপদ, পদে পদে। আপদ বিপদ, প্রতিনিয়ত মাথার উপর দিয়া, চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। কখন কি হয়, বলা যায় না। ভবিষ্যৎ,—ঘন তিমিরাচ্ছন্ন, দুর্ভেদ্য।

গোবিন্দপুরের জমিদার — গোবিন্দবন্ধু ঘোষ। গোবিন্দপুর ও হাসিকান্না পরস্পর নিকটবর্ত্তী গ্রাম। এ পর্য্যন্ত রায়েদের সহিত ঘোষেদের পুরুষানুক্রমে সদ্ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের বিবাহের পর, ঘোষেদের প্রজার সহিত, কোন জমির সীমানা লইয়া, রায়দের প্রজার সঙ্গে একটী গুরুতর বিবাদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। সেই সূত্রে উভয় পক্ষে বিশেষ মনোবাদ চলিতে থাকে। নিমন্ত্রণামন্ত্রণ, খাওয়া দাওয়া, আলাপব্যবহার পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়; ক্রমশ শত্রুতা বাড়িতে থাকে। এমন কি একপক্ষের লোক

অপর পক্ষের লোকের সহিত একপথেও চলে না। এই মনোবাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষেরা রায়দিগকে কয়েকটি জাল মোকদ্দামায় অস্থির করিয়া তুলে। কিন্তু, ধর্ম্মের জয় চিরদিনই। ঘোষেরা যতগুলি মিথ্যা মোকদ্দামা করিয়াছিল; বিচারালয়ের সুবিচারে সকলগুলিতেই পরাজিত হয়। সেই সব মোকদ্দামায় ঘোষ জমিদারের মেয়াদ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কেবল রায়েদের তাচ্ছল্যে তাহা হইতে, নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। কারাগারে দেওয়া রায়েদের ইচ্ছা নয়।

যদিও মেয়াদ দেওয়া, রায়েদের অভিলাষ ছিল না, তথাপি, ইহাতে ঘোষেদের অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কাজেই ঘোষেরা হীনবল হইয়া পড়িল। অর্থে, জোর ও তেজ বৃদ্ধি হয়—অসৎ পাত্রে পড়িলে। অসৎ পাত্রে অর্থ বেশীদিন স্থায়ীও হয় না। ঘোষেরা এত যে নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তবুও নানা রকমে বিপক্ষীয় প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে ছাড়িল না। শেষে, রায়মহাশয়, একটী সামান্য মোকদ্দামায়, ঘোষদিগের, সমস্ত বিষয় সম্পত্তি নিজ আয়ত্বে আনিলেন। সেই হইতে ঘোষদের দিনান্তে এক সন্ধ্যাও জুটিয়া উঠে না।

জ্বর বিকারে ও খাদ্যাভাবে গোবিন্দবন্ধু ঘোষের মৃত্যু হয়। মৃত্যু শয্যায়, ঘোষ মহাশয় পুত্রকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন যে, যে প্রকারে হউক, রায়দের বংশে বাতি দিতে

কেহ না থাকে, এমন করিবে। যদি তাহাও না পার; তবে ছলে বলে, কলে কৌশলে, ঐ বংশে এমন একটী কলঙ্ক দিবে, যাহাতে পৃথিবীর লোক পর্য্যন্ত হাসে। পুত্র, পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবে বলিয়া, প্রতিশ্রুত হইল।

প্রতুল, গোবিন্দবন্ধু ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। পিতার মৃত্যুর পর, পিতার সুপুত্র, রায়েদের সহিত, অন্য কোন প্রকারে না পারিয়া কলঙ্ক দিবার সুযোগ দেখিতে লাগিল। সুযোগ ঘটিতে বিলম্ব হয় কি ?

না।

কেন ?

এটি যে কুপথ।

কুপথ, বড় সবল।



দশম পরিচ্ছেদ।

—:o:—

গৌরমণি নাপিতিনী।

গৌরমণি মানুষ—জাতিতে অবলা। এপর্য্যন্ত জানা ছিল। নামের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না "তন্ত্রকোষে," একথা লেখা নাই। গৌরমণির সহিত গৌরাঙ্গের কোন সম্পক ছিল না, কিম্বা গৌরমণি বলিয়া কোন মণিমাণিক্য, এ জগতে কেহ কখন দেখিতে পায় নাই—ইহা আমরা বেশ অবগত আছি। গৌরমণি, বিধবা—কেন না, সাদা কাপড় পরিত, সিন্দূর পরিত না। বটবৃক্ষ যেমন তেল সিন্দূর পরিয়া থাকে, গৌরমণি আদৌ তাহা পরিত না। কিন্তু বটবৃক্ষের মত অনেককে ছায়া দান করিত। অনেক কাক ও চিল, সেই মহাশাখায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত, দিন রাত কোলাহল করিত। কোলাহলে,

এ পাদপের ক্রমশই প্রতিপত্তি বাড়িতেছিল। গৌরমণির বর্ণ,—চতুর্বর্ণের মধ্যে সে কোন্ বর্ণের, কেহই তাহা ঠিক করিতে পারিত না, তুরুস্ক শব্দের অর্থে লেখা ছিল, গৌরমণি চতুর্বর্ণের আভাযুক্ত ঈষৎ গাঢ় নীল। গৌরমণির নাক—সে নাক দেখিয়া, নাকচাঁদ পাগল, অমনি সে এ নাকের নক্সা আঁকিয়া, তেরিটি বাজারে বিক্রয় করিতে লাগিল। আর চক্ষু—এ চক্ষুর কাছে বর্জসের ক্ষুরের ধার লাগিত না; সে অক্ষি কত পক্ষীকে পিঞ্জিরায় পুরিয়াছে, হর্যাক্ষও এ অক্ষি দেখিলে হারিয়া যাইত, এবং এ যুগল গবাক্ষ গোলকের আলোকে লোকের চক্ষে ধাঁধাঁ ও তাক্ লাগিত। গৌরমণির কণ্ঠনালী ছিল। *Anatomy* দেখিয়া ইহা এক রকম ঠিক করিয়া লওয়া হইয়াছে। সেই কণ্ঠনালী দিয়া, গানের গড্ডলিকা প্রবাহ প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত হইত। সে প্রবাহে যে আসিয়া পড়িত, সেই ভাসিয়া যাইত। সকলেই বলিত, গৌরমণি "সিদ্ধহস্ত"। যাহা ছুঁইত, তাহাই সিদ্ধ হইয়া যাইত। ভাত ব্যঞ্জন—এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়া যাইত, ঢোল ত ঝোল্। তবলা ত তরকারীর মধ্যে!! গৌরমণির এত গুণ, এ গুণের জোরে বড় বড় পানসি টানিতে পারিত।

একদিন গভীর রাত্রিতে গৌরমণি গান করিতেছে; এমন সময়, একটী লোক আসিয়া কপাটে আঘাত করিল।

গৌরমণি, আঘাতের শব্দ শুনিবামাত্র, ষাঁড়ের ন্যায়, নাকের ডাক তুলিয়া দিল। ভাণ—সুষুপ্তির! উপর্য্যুপরি দরজায় আঘাত হইতে লাগিল। গৌরমণি, তখন আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না। মুখের ভিতর অঞ্চলের অর্দ্ধখানা কাপড় গুঁজিয়া দিয়া ধীরে ধীরে হাসিতে লাগিল। কতক্ষণ পর বলিল, "রাত্রি দিন কেবলি ঠক্ ঠক্। পোড়ামুখদের নিমিত্ত একটুও ঘুমাবার যো নেই। এবার চৌকীদার ডাকিব না কি?"

চৌকীদারের কথা শুনিয়া বাহিরের লোকটি অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইল। পরে, ধীরে ধীরে বলিল,

"গৌর, গৌরমণি আমার। কপাট খোল; আ-মি—"

গৌরমণি, জন্মেও আর এমন সুমধুর সম্বোধন শ্রবণ করে নাই। "গৌরমণি আমার" এ কথাটি তাহার পরাণ যেখানে থাকে, সেই স্থানে যাইয়া, বিধ্বনিত হইল। কথাটিতে গৌরমণির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন খসিয়া পড়িবার উদ্যত হইল। গৌরমণি, কপাট খুলিতে গেল বটে, কিন্তু খুলিতে পারিল না। কপাটের অর্গলে হাত লাগিয়া রহিল। শীঘ্র শীঘ্র খুলিবার নিমিত্ত, কতবার চেষ্টা করিল, একবারও কিন্তু পারিল না। অনেক চেষ্টার পর, অর্গল খুলিল সত্য; তবুও দেহের অবসন্নতা ঘুচিল না। লোকটি, কপাট খুলিবামাত্র, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। গৌরমণি, আগন্তুক লোকটীকে চিনিত;

দেখিয়াই কি যেন হইয়া গেল। ভাবিল, আজ তাহার সুপ্রভাত। সুপ্রভাত কি কুপ্রভাত পরে বুঝা যাইবে।

আগন্তুক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়াই, গৌরমণিকে কপাটে অর্গল দিতে বলিল। গৌরমণি কিন্তু উদ্ভ্রান্ত চিত্তে, অগ্রেই অর্গল দিয়া বসিয়া আছে। কাজেই আর অর্গল দিতে হইল না। লোকটি, গৌরমণির হাত ধরিয়া আনিয়া নিকটে বসাইল। এ হাত ধরায় গৌরমণির আত্মাপুরুষ আরও ধড়্ ফড়্ করিতে লাগিল। সম্মুখে বসিলে পর, লোকটা গৌরমণির কাণে কাণে কি কথা কহিতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে, অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। কথা কহিবার সময়, কথকের মুখ, গৌরমণির কূপ কপোলে লাগিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাতে না কি গৌরমণি মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন।

গৌরমণি, লোকটির সমস্ত কথা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিল। কথাগুলি শুনিয়া, মনকে দৃঢ় রজ্জুতে বাঁধিয়া, ভাবিতে আরম্ভ করিল। ভাবিল, ইহার কার্য্য করিব। এ কার্য্যের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইব না। এ কার্য্যের প্রতিদানে ধন অর্থ—অন্য কিছুই অভিলাষ করি না; কেবল——

গৌরমণি, আর ভাবিতে পারিল না। সহসা গৌরমণির মনের ভিতর নানা প্রকার প্রশ্নোত্তর হইতে লাগিল।

প্রশ্ন হইল,

"হৃদয়ে বসিবে কি?"

উত্তর। বসিলে বসিতে পারে; কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত।

প্রশ্ন। কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত যে বসিবে, তাহার বিশ্বাস কি?

উত্তর। বিশ্বাস আর কি? বিশ্বাস আজিকার আগমন।

প্রশ্ন। ভাল; অদ্যকার আগমনে এমন কি আছে, যে বিশ্বাস করিতে পার?

উত্তর। (এ সময় গৌরমণির মুখে ঈষৎ হাসির রেখা পড়িল।) কি আছে? না আছে কি? সকলি আছে— দ্বেষ, হিংসা, এমন কি একঘরের সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত আছে।

প্রশ্ন। কার্য্যোদ্ধার করিয়া যদি চলিয়া যায়?

উত্তর। কোথায় যাইবে?

প্রশ্ন। যেখানে তাহার অভিরুচি।

উত্তর। বল কি? গৌরমণির হাত ছেড়ে পালাবে? তা পারিবে না।

গৌরমণির কপাল কুঞ্চিত হইল।

প্রশ্ন। তুমি কি করিবে? তুমি ত আর জজ বাহাদুর নও যে, কিছু করিতে পারিবে?

উত্তর। আমি জজ নই, বাহাদুর নই—নরপিশাচী! (দন্তে দন্তে পেষণ করিয়া) হৃদয়ের শোণিত পান করিব!!

প্রশ্ন। সে বড় কঠিন কার্য্য; পারিবে?

উত্তর। খুব পারিব, খুব পারিব।

গৌরমণি, এখানে উল্লসিত হইল।

প্রশ্ন। ঠিক?

উত্তর। ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকটি, গৌরমণির মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল। সময় সময় গৌরমণির মুখ ভঙ্গি দেখিয়া, ভীত ও বিচলিত হইতেছিল। কিন্তু, গৌরমণি, যখন হাসিয়া বিশেষ আশ্বাস দিয়া কহিল যে, প্রাণ দিয়াও তাহার কার্য্য করিবে, তখন আনন্দে বড়ই উৎফুল্ল হইল। পরে, প্রফুল্লমনে, সেদিন বাড়ী ফিরিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—*০*—

গৌরমণির পর্য্যালোচনা।

প্রভাত হইল। গৌরমণি, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া, রায়বাড়ী অভিমুখে চলিল। কেন চলিল বলিতে পারি না। অবশ্য কোন উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য ভিন্ন কার্য্য হয় না। গৌরমণির বাড়ী, আর রায়বাড়ী, বড় বেশী ব্যবধান নহে। বড় জোর দশ পোনের মিনিট। গৌরমণি, অতি দ্রুতবেগে হাঁটিয়া, রায়বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তখন বেলা প্রায় দুই দণ্ড হইয়াছে। গিন্নী, উঠিয়াছেন মাত্র। বাড়ীর অন্য সকলেই, গিন্নীর অগ্রে উঠিয়াছে। গিন্নী, গৌরমণিকে অতি ভোরে দেখিয়া কহিলেন,

"কি গা, গৌরমণি, এতদিন কোথায় ছিলি? বাবার বিয়ের পর, একদিনও ত দেখি নেই।"

গৌরমণি, রায়েদের বাড়ীর নাপিতিনী নয়। যদিও বাড়ীর নাপিতিনী না হউক; তথাপি গিন্নী, গৌরমণিকে

বড ভালবাসেন। গৌরমণি, সদা সর্ব্বদা বাষবাড়ীতে যাতায়াত করিয়া থাকে; কেহ কিছু বাধা কবিতে পাবে না। সে কেবল গিন্নীব নিমিত্ত।

গৌরমণি, গিন্নীব কথা শ্রবণ কবিয়া, মৃদুভাবে বলিল,

"সে দিন মাসী-মা এসেছিলেন। তিনি বাড়ী যাবাব সময়, আমাকে সঙ্গে করে, তাঁদের বাড়ী নিয়ে গেলেন। আজ প্রায় দুমাস পর, বাড়ী এসেছি। এসেই আপনাব সঙ্গে দেখা কবিতে এলেম।"

গৌরমণি, সকলি মিথ্যা কথা বলিল। কারণ, এ সংসারে গৌরমণির আপন বলিতে কেহ নাই। গৌবমণি, বাড়ী ছাডিয়া, কোথায়ও কোন দিন যায় নাই, মবণ পর্য্যন্ত যাইবেও না। যাইবার স্থান থাকিলে ত! বাড়ীই, নাপিতিনীর যথাসর্ব্বস্ব। গিন্নী, সরল মানুষ, নাপিতিনীব কথাই বিশ্বাস করিলেন। কহিলেন,

"আজ কাল বুঝি, তুই আমাদের বৌ মাকে দেখিস্ নেই। যা, দেখ্ যেয়ে, যেন সোণাব প্রতিমা! মা, আমার লক্ষ্মী সতী।"

প্রকৃতপক্ষেই ইন্দুমতীর লাবণ্য যেন শ্রাবণেব জলেব ন্যায় উছলিযা উছলিয়া পডিতেছিল। যৌবনে, নায়ক সংস্পর্শে নায়িকার রূপ লাবণ্য বৃদ্ধি পাইয়াই থাকে। ইন্দুমতীরও বাড়িয়াছে। গৌরমণির নিকট এ প্রশংসা ভাল লাগিল না। সে কাহারঁ প্রশংসা শুনিতে কি সুখ দেখিতে

পাবে না। অন্যের সুখে তাহার গাত্রদাহ জন্মে। গিন্নীর কথায় ভ্রূকুঞ্চিত করিল। মনে মনে ইন্দুমতীর রূপে ছাই দিল, আর কত কি করিল। পরে, প্রকাশ্যে বিকৃতস্বরে কহিল,

"কৈ, বৌ-মা ?"

বলিয়াই খুক্ খুক্ করিয়া কয়েকটি কাশি দিল।

গিন্নী, বুঝিল, কাশি এসেছে বলিয়াই স্বরটি বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু, গৌরমণির দুষ্টামি বুঝিলেন না। কহিলেন,

"এখনো উঠে নাই বুঝি। মা, আমার সমস্ত দিন কাজ করে। এখনি উঠিবে, একটু বস্ না। বাড়ী যাবার সময় চাল-ডাল নিয়ে যাস্।"

গৌরমণি, যখনি রায়বাড়ীতে আসে; তখনি গিন্নী, গৌরমণিকে চাল-ডাল দিয়া থাকেন। পূর্ব্ব প্রথামত, আজিও দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। গৌরমণি, নিতান্ত নিরাহ ভাব দেখাইয়া, বলিল,

"চাল-ডালের জন্য কি ? আপনাদের খেয়েই সাত পুরুষ মানুষ হয়েছি। আপনি যান; আমি ক্ষেতির কাছ থেকে আসি।"

ক্ষেতির পূর্ণ নাম—ক্ষেত্রমণি। গৌরমণি, তাচ্ছল্য ভাবে ক্ষেতি বলিয়া ডাকিয়া থাকে। ক্ষেত্রমণি, গিন্নীর দাসী।

তখন গৌরমণি, অন্দরমহলের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোথায়ও ইন্দুমতীকে খুঁজিয়া

পাইল না। বস্তুত ইন্দুমতীর অন্বেষণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। "ক্ষেতির কাছ থেকে আসি" এটিও ফাঁকি। উঠান ঝাঁট দিতে দিতে, ক্ষেত্রমণি আসিয়া, গৌরমণির সম্মুখে পড়িল। ক্ষেত্রমণিকে দেখিবাই, কেমন একটা হাসি দিল। কহিল,

"কি গো, বোন। এখন বুঝি তোদের সকালে ঘুম ভাঙ্গে না? বড় লোকের বাড়ীতে থাকিতে থাকিতে, বড় লোক হয়ে পড়েছিস্ বুঝি?"

ক্ষেত্রমণি, বড় নির্ব্বোধ মেয়ে মানুষ। গৌরমণির বিদ্রূপ বুঝিল না। কহিল,

"কেন, বোন? আমরা ত খুব সকালে উঠেছি। তুমি কখন এলে?"

গৌরমণি, কতই যেন আপ্যায়িত ভাবে বলিল,

"সে কথায় কাষ কি, বোন। তোমাদের যে দেখা পেলেম, এই আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি।"

ক্ষেত্রমণি ভাবিল, কতই যেন তাহার অপরাধ হইয়াছে। নিতান্ত শিথিল ও সরলভাবে কহিল,

"আমরা ভাই দাসীবান্দি মানুষ। অবসর পেলে ত দেখা করিব? পরের খাটুনি খেটেই আমাদের জীবন গেল।"

এই বলিয়া, উঠান ঝাঁট দিতে দিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। গৌরমণি কহিল,

"একটু ব'স না, ভাই! এতদিন পর দেখা হ'ল; দুটি সুখদুঃখের কথা বলিতে নেই কি?"

ক্ষেত্রমণি। আমাদের আবার সুখদুঃখ কি, বোন?

গৌরমণি দেখিল, ক্ষেত্রমণি, ভালরূপ আলাপ করিতেছে না, আলাপ করিবার যেন অভিরুচি মাত্রেই নাই। তখন আপন উদ্দেশ্য সাধনার্থ কহিল,

"বৌ কোথায় গা, বোন?

বলিয়াই মুখভঙ্গি করিল। ক্ষেত্রমণি তা দেখিল না। বলিল,

"খিড়কীর বাগানে। বড় সুন্দর বৌ।"

গৌরমণি তখন অতি দ্রুতপদে খিড়কীর বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, ইন্দুমতী সেখানেই আছে। গৌরমণি, সম্মুখে আসিয়া, ঈষৎ নাক টানিয়া কহিল,

"কি গো, বৌ? এখানে কেন? বড় রাণী সেজে যে বসে আছ!"

ইন্দুমতী অনন্যচিত্তে ফুল তুলিতে ছিল। গৌরমণির কথা শুনিতে পাইল না।

গৌরমণি, রাগিল। অতি সহজে রাগা—তাহার একটা স্বভাব দোষ। পরে, কর্কশভাবে কহিল,

"মাগির দেমাক দেখ। এ দেমাকে ছাই পড়ুক। বড়লোকের বৌ হয়ে অহঙ্কারে মাটিতে পা ফেলিতে চায় না। এ অহঙ্কারে নিপাত যাও—শিঘ্র নিপাত যাও।"

ইন্দুমতী, গৌবমণিকে চিনে না। অথচ, রায়বাড়ীতে আসিযাও কখন দেখে নাই। কাজেই অপবিচিতা গৌরমণির গালিগালাজ শ্রবণে চোখে জল আসিল। বলিল,

"কে গো, তুমি? এমন গালি দিচ্ছ কেন?"

গৌবমণি, আবাব বিকট মুখভঙ্গি কবিল; বিকৃতকণ্ঠে কহিল,

"আমাকে চিন না? আমি তোমাব যম।"

এই বলিয়া, গৌবমণি, সেইখান হইতে অতি দ্রুতবেগে বাহিব বাড়ীব সিংহদ্বাবের নিকট চলিযা আসিল। দেখিল, দোবেঠাকুব এদিক ওদিক ঘুবিয়া পাহাবা দিতেছে। দোবেঠাকুর ঘুবিয়া সম্মুখে আসিল,—গৌবমণি৺ তাহার প্রতি বিষম বিলোল কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:**:—

ভীষণ স্বপ্ন।

রজনী চাবিদণ্ডেব সময়, ইন্দুমতী নিজহস্তে শয্যা বচনায় প্রবৃত্ত হইল। বাগানেব বিবিধ ফুল আনিয়া, বিছানাব চাবিদিকে ছড়াইয়া দিল। মশারিব ঝালবেব সহিত, যুঁই ফুলেব মালা গাঁথিয়া বাখিল। ফুলেব ছড়াছড়ি গড়াগড়ি হইতে লাগিল। ফুলেব সুগন্ধি সুবাসে, গৃহ পবিপূবিত হইল। বিছানা কবা হইলে পব, ইন্দুমতী, নবেন্দ্রনাথেব আগমন প্রতীক্ষা কবিতে লাগিল। কিন্তু, নবেন্দ্রনাথ আসিতেছে না। তিল তিল কবিয়া, যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল; ইন্দুমতীব উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, ততই প্রবলতব হইতে আবন্ত হইল। এই আসে, এই আসে ভাবিয়া, একবাব উঠিয়া দাঁড়ায়; আবাব বসে, আবার উঠিয়া যাইয়া কপাটেব নিকট দাঁড়াইয়া কি দেখিতে থাকে। আসাব আশায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল; তবুও নবেন্দ্রনাথ আসিল না।

তখন ইন্দুমতী, উন্মাদিনী ব্রজকামিনীর ন্যায় উন্মত্তা হইল। ইন্দুমতী, কবরী উন্মুক্ত করিয়া কুটিল কুন্তলগুচ্ছ এলোমেলো করিল; এক গোছা নির্ম্মুক্ত কেশ ধরিয়া, শুধু শুধু টানিতে লাগিল, টানিতে টানিতে কতকগুলি চুল ছিঁড়িয়া ফেলিল। অবশেষে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া শয়ন করিল। শয়নকালে, আগুল্ফ প্রলম্বিত কেশপাশের কিয়দংশ পৃষ্ঠতলে, কিয়দংশ কপালের উপর, কতকগুলি মুখের উপর নিপতিত হইল। ইন্দুমতী, ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। অথবা জানিয়াও কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিল না। পাগলিনীর ন্যায় শয়ন করিয়াই রহিল। কিয়ৎকাল পর, ইন্দুমতীর অগোচরে তন্দ্রা আসিল। স্বপ্ন দেখিল :—

পশ্চিম আকাশে যেন ঘোর আগুণ লাগিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল প্রভঞ্জনও যেন বিশ্বগ্রাস করিবার নিমিত্ত, সিন্দূর বিনিন্দিত প্রদীপ্ত অনলের অনন্ত শিখার সহিত বিপর্য্যয় ভাবে তুমুল যুদ্ধ করিতেছে। সেই ভীষণ-অনল-ধূমে জগতকে এক একবার নিবিড় ঘন তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনীর ন্যায় আঁধার করিয়া ফেলিতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রচণ্ড অনিল আসিয়া যেন এক ঝাপটে, সেই ভীষণ ধূমরাশিকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে। যেই ধূমরাশি, চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে; অমনি আবার ভয়ঙ্কর অনল, সশিখায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

সেই অবিরাম প্রখর অনলান্তর হইতে যেন প্রলয় কালের জলদ প্রক্ষিপ্ত বিদ্যুতধ্বনির ন্যায় অনন্ত গর্জ্জন হইতেছে। সে ধ্বনির বিরাম নাই—অবিরাম অনন্ত ধ্বনি। সেই ভীষণ শব্দে পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, প্রাণীমাত্রেই আতঙ্কে শিহরিতেছে এবং সেই অনলে পড়িয়া, সকলেই যেন মরিতেছে। মরিবার সময় যন্ত্রণায় যেন ছট্ ফট্ করিয়া হস্তপদাদি আলোড়ন বিলোড়ন করিতেছে। ইন্দুমতীও যেন অগ্নিতে পুড়িয়া মরিবে। সেই ভয়ে তাহার শরীর বাতবিক্ষোভিত বৃক্ষ পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। ইন্দুমতীর ত্রাস অবলোকন করিয়া যেন শ্মশান পিশাচকুল, শূন্য হইতে দন্তপাতি বিস্ফারিত করিয়া, খল্ খল্ হাসিতেছে—বিকট টিট্কারী দিতেছে এবং আনন্দোল্লাসে উন্মত্ত হইয়া, ধেই ধেই নাচিতেছে—হাততালি দিতেছে—বীভৎস মুখভঙ্গি করিতেছে।

অকস্মাৎ একটী জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আসিয়া যেন ইন্দুমতীর কাপড়ে পড়িল। পড়িতেই কাপড় খানা, ধপ্ ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দুমতী তখন সকাতরে করজোড়ে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল। ডাকিল, হে বিপত্তিভঞ্জন, শ্রীমধুসূদন! আমাকে দগ্ধ করিও না! এখনও আমার দেবসেবা পরিপূর্ণ হয় নাই। এই কয়টি কথা বলিতে না বলিতেই যেন ইন্দুমতীর অর্দ্ধাঙ্গ পুড়িয়া গেল। তথাপি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। কেবল গভীর ভক্তির

সহিত, একাগ্রমনে ভগবানের নিকট বলিতে লাগিল। বলিল, এইমাত্র দেবতার অর্চ্চনা শিখিতেছি, ঠাকুর, অসময়ে প্রাণ লইও না। যদিও অর্দ্ধাঙ্গ পুড়িয়াছে, তথাপি রক্ষা কর, আমি জনমদুঃখিনী। কিন্তু, ভগবান্, ইন্দুমতীর এই হৃদয়স্পর্শী কাতরোক্তি শুনিলেন না। শুনিলে আর সংসারে ভাবনা ছিল কি?

কেবল দেখাইলেন, সেই জ্বলন্ত অগ্নির ভিতরে, এক অপূর্ব্ব পবিত্র রমণীমূর্ত্তি। আলুলায়িত কেশা, গৈরিক বসন পরিধানা, ত্রিশূলধারিণী রমণীকে দেখিয়া, ইন্দুমতীর একটু সাহস জন্মিল। মূর্ত্তিটিও যেন ইন্দুমতীকে অভয় প্রদান করিয়া, সস্নেহে কহিলেন, "মা, তুই ভয় করিস্ না। তোর ঘোর বিপদকাল উপস্থিত। অনেকবার তোমায় পরীক্ষা করিয়াছি, এবার শেষ পরীক্ষা। এবার অনেক ক্লেশ পাইবি। সে ক্লেশ সহ্য করিয়া, যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিস্, তবে স্বর্গবাস হইবে। তোর আরাধ্য দেবতার পূজা, এ পরীক্ষায় বুঝা যাইবে। সংসার ভীষণ স্থান। এখানে প্রলোভনের রাজত্ব। সেই প্রলোভনে পড়িয়া, দেবতার পূজা ভুলিস্ না।" মুহূর্ত্তমধ্যে এই কথাগুলি বলিয়া, রমণী অন্তর্দ্ধান হইলেন। ইন্দুমতী তন্দ্রাবেশেই জিজ্ঞাসা করিল, "মা, অনেকবার পরীক্ষা করিয়াছ, তবুও আবার পরীক্ষা কেন? সেই সমস্ত পরীক্ষায় কি কিছু বুঝিতে পার নাই? এ তোমার কি

রীতি, মা ?" অন্তরীক্ষ হইতে রমণী উত্তর করিলেন, "মা, যতবার পরীক্ষা করিয়াছি, ততবারই জিতিয়াছ। এবারকার পরীক্ষা কেবল তোমাকে স্বর্গে লইবার জন্য।"

আবার ইন্দুমতী, রমণীকে ভালরূপ দেখিবার নিমিত্ত, তন্দ্রাবেশে চক্ষু মেলিল। কিন্তু, আর রমণীকে দেখিতে পাইল না। আরও যেন কত কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াছিল, তাহাও পারিল না। সেই সময় তাহার সমস্ত শরীর যেন অবসাদে জড়াইয়া ধরিয়াছে। অসীম যাতনা সম্বরণ করিতে অপারগ হইল। ভয়ে চিৎকার দিয়া উঠিল। জাগিল। জাগিয়া বিছানায় হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখিল, নরেন্দ্রনাথ নাই। ইন্দুমতীর প্রাণ তখন ভয়ে আরও দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। স্বপ্ন জানিতে পারিয়াও চিত্তোদ্বেগ নিবারণ করিতে পারিল না।

ইন্দুমতী, স্বপ্ন দেখিয়া, চিৎকার দিবার পূর্ব্বেই নরেন্দ্রনাথ, শয়নার্থ ঘরে আসিয়াছিল। কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে নাই। কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া ইন্দুমতীর শয়ন সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। যৌবন, প্রাবৃটকালীন প্রগাঢ় জলদমালার ভিতরে যেন সৌদামিনী হাসিতেছে। অম্বরের তড়িৎ, ক্ষণস্থায়ী। নয়ন ভরিয়া দেখিতে পারা যায় না। তড়িত বিকাশের পরক্ষণেই মেঘ ডাকিয়া বলে, চাহিবে ত মাথা ভাঙ্গিব—প্রাণ নিব। কাজেই সেই ভয়ে কেহ তড়িতের দিকে চায় না। বরং মাথায় হাত দিয়া "জৈমিনি

জৈমিনি” করিতে করিতে, লুকাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু ধরাতলে এ স্থিরসৌদামিনী, চঞ্চলতা বিবর্জ্জিতা। বাসনা পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলেও এ চপলা মেঘান্তরালে লুকাইবে না। নরেন্দ্রনাথ, অনিমিষ লোচনে, ইন্দুমতীর অনিন্দিত শয়ন-সৌন্দর্য্য বিলোকন করিয়াও দর্শনাভিলাষ পূরাইতে পারিল না। মনে মনে ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, যদি সহস্র চক্ষু পাইতাম, তবে বুঝি এ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি জন্মিত। আমরা কিন্তু জানি:—

“নিস্বোব্যষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো,
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বংপুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি,
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কোগতঃ॥”*

আশার নিবৃত্তি নাই।

যাহাহউক, যেই ইন্দুমতী চিৎকার দিয়া উঠিল; অমনি নরেন্দ্রনাথ, গৃহে প্রবেশ করিয়া ইন্দুমতীকে জড়াইয়া ধরিল। ইন্দুমতীও ভুজলতায় বেড়িয়া ধরিয়া, কাঁপিতে লাগিল। নরেন্দ্র, অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত, জিজ্ঞাসা করিল,

“ইন্দু, একি। একি! চিৎকার করিলে কেন?”

ইন্দুমতীর উৎকণ্ঠা এখনও উপশমিত হয় নাই। কাজেই নরেন্দ্রের কথায়, কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। নরেন্দ্রনাথ, আরও বিস্মিত হইল। বলিল,

---

* শান্তিশতকম্, ১ম পরিচ্ছেদ, ২৪ শ্লোক।

"ইন্দু, অমন করিতেছ কেন? কি হয়েছে?"

এই বলিতে বলিতে, নরেন্দ্রনাথ দেখিল যে, ইন্দুমতী মূর্চ্ছিত হইয়া, ভূমিতে পড়ে পড়ে। তখন তাড়াতাড়ি, ইন্দুমতীকে ধরিয়া, নিজের কোলের উপর রাখিল। মাথায় জলসিঞ্চন করিতে লাগিল; নিকটেই জল ছিল। কিঞ্চিৎকাল পরেই ইন্দুমতীর চৈতন্যোদয় হইল। নরেন্দ্রনাথ পুনবায় ভীত-চিত্তে কহিল

"ইন্দু, অসুখ করেছে কি?"

ইন্দুমতী, এবার ধীরে ধীরে বলিল,

"না।"

নরেন্দ্র। তবে অমন করিতেছ কেন?

ইন্দুমতী তখন নরেন্দ্রনাথের সন্নিধানে আমূল স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ হাসিল। বলিল,

"ছি! তুমিও দেখছি এক পাগল। স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয়?"

ইন্দুমতী, নীরব।

নরেন্দ্রনাথ তখন ইন্দুমতীর ভয় অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিল।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দোবেঠাকুর।

রমণী কটাক্ষ, চুম্বক পাথর। এই চুম্বকের আকর্ষণে, মানুষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ আপনি পড়ে,—আপনি মরে। সামান্য বায়ু প্রবাহে যেমন সাগরে তরঙ্গ খেলিতে থাকে, মহাপ্রাণীর প্রাণও তেমনি অতি সহজে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়, হিমাদ্রি টলে, সোণার সংসার ভাসিয়া যায়, মানুষ আত্মপর ভুলিয়া যায়,—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তাই বলিতেছি, সংসারে এ কুহক কেন?

মহাদেব দোবে, একদিন একবার মাত্র একটী রমণীর বিলোল কটাক্ষ অবলোকন করিয়াছে। সেই আকর্ষণে, এখন দোবেঠাকুর মাটি হইয়া গিয়াছে; তাহার বিলাস-হৃদয়-প্রসূনে কীট প্রবেশ করিয়াছে, কোন কার্য্যেই মন প্রবেশ করিতেছে না, কেবল সেই কটাক্ষ, হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছে; অবিরত সেই ভাবনায়, সেই চিন্তায়,

হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে, দোবেঠাকুর প্রভুর আদেশ সযত্নে প্রতিপালন করিত; তাহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া, কেহ রায়বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিত না। আর এখন যে সে রায়বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে, রায়মহাশয়ের আদেশ উপেক্ষিত হইতেছে, এখন দোবেঠাকুর সিংহদ্বারে লাল বনাতের জামা প্রভৃতি পরিধান করিয়া, কেবল বসিয়া থাকে মাত্র। ভাল মন্দে আর ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অন্ধকার রাত্রি। জগৎ ঘন আঁধারে পরিবৃত। কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। দোবেঠাকুর, ভাবনার প্রভূত তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া, গভীর রাত্রিতে, ঘন নিবিড় আঁধার ভেদ করিয়া, একটী রমণীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। রমণী, দোবেঠাকুরকে দেখিয়াই কটাক্ষ করিল। কাটাঘায়ে লবণের ছিটা দিলে যেমন হয়, এ কটাক্ষে দোবেঠাকুরের প্রাণও তেমনি হইল। দোবেঠাকুর আর সম্বরণ করিতে পারিল না। অমনি রমণীর পদতলে পড়িয়া প্রেমভিক্ষা করিতে লাগিল। বলিল,

"দেখ সুন্দরী, তুমি বড়ই সুন্দরী। আমি তোমার কাছে হনুমান তুল্য।"

দোবেঠাকুর, হিন্দুস্থানী লোক। কথাগুলি হিন্দিতেই বলিতেছিল। কেবল, পাঠক পাঠিকার সুবোধার্থে আমরা বঙ্গভাষায় বলিব।

দোবেঠাকুর, রমণীর গাত্রে হাত দিবা, এই কথাগুলি বলিতে যাইতেছিল। রমণী, তাহা দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। পরে, বলিল,

"মর, মিন্সে? গায় হাত দিচ্চিস্ কেন?"

আবার কটাক্ষ।

এ কটাক্ষে, দোবেঠাকুর পুড়িয়া মরিল। উন্মত্তভাবে বলিল,

"আরে সুন্দরী, আমি পাগল হইয়াছি,—তোমার কটাক্ষ দেখিয়া আমার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া গিয়াছে।"

রমণী, খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে, বলিল,

"পাগল হয়েছিস্ ত গোসাঁইর... ...র এস্থান নয়।"

পুনর্বার কটাক্ষ।

দোবেঠাকুর, এবার সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাইল। রমণীর প্রলোভন পূর্ণ কটাক্ষ ও হাসি দেখিয়া, উল্লাসে মাতিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিল,

"চলনা সুন্দরী, চলনা, তোমার যাই। তোমার কোন জায়গায়?"

এই বলিয়া, রমণীর হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া চলিল। তখন গৌরমণি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। হাত ঝাড়া দিয়া কহিল,

"কি পোড়ারমুখ, গায় হাত দিয়ে কথা? দাঁড়াও ঝাঁটা দিয়ে কাঁধের ভুত তাড়াচ্ছি!"

গৌরমণি, ঝাঁটা খুঁজিতে লাগিল। প্রকৃতই কি গৌরমণি ঝাঁটা খুঁজিতেছিল? না, গৌরমণি, দোবেঠাকুরকে দিয়া কোনও কার্য্য উদ্ধার করিবে স্থির করিয়াছে। তন্নিমিত্তই সেইদিন রায়বাড়ী হইতে আসিবার সময়, দোবেঠাকুরের প্রতি বিষম বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়াছিল। সেই কটাক্ষের ফল, এতদিনে ফলিতে চলিল। ঝাঁটা, অন্বেষণ করা, ছলনা মাত্র।

এদিকে গৌরমণির প্রচণ্ডমূর্ত্তি দেখিয়া, দোবেঠাকুর দূরে সরিয়া দাঁড়াইল: সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। মনে মনে একবার ভাবিল, কৈ, আমি যাহার জন্য, প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সে ত আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। বরং রাগিয়া উঠিয়াছে। আবার ভাবিল, বাঙ্গালি রমণী, হাতধরা প্রথাটা বুঝি, বাঙ্গালিদের বড় নিন্দনায়। তবে ত বড় অন্যায় হইয়াছে। আমি না বুঝিয়া ভুল করিয়াছি। এখন ক্ষমা প্রার্থনা করি। এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া, গৌরমণির মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আগ্রহের সহিত কহিল,

"আরে সুন্দরী, কেন গোসা কর? আমি ত তোমার নফর। তুমি যাহা করিতে বলিবে; আমি তাই করিব।"

গৌরমণিরও ইহাই অভিলাষ।

তখন গৌরমণি, শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। দোবেঠাকুরের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসার ভাব দেখাইতে লাগিল। উপর্য্যুপরি তামাক ও পান আনিয়া দোবেঠাকুরকে দিতে লাগিল

নানা প্রকার কৌতুকের কথা বলিতে লাগিল। দোবেঠাকুর ত পূর্ব্বেই গলিয়া গিয়াছে ; এখন আরও গলিয়া গেল।

গৌরমণি, সেই অবসরে দোবেঠাকুরের নিকট অতি সংগোপনে একটী কথা বলিল। দোবেঠাকুর শুনিবামাত্র ওঁহো করিয়া নিষেধ করিয়া উঠিল ; থরহরি কাঁপিতে লাগিল। গৌরমণি, বলিয়া উঠিল,

"একি! দোবেঠাকুর, এই কি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা? এই কি আমার কার্য্য করা?"

গৌরমণি, বিষম কুটিল কটাক্ষ করিল।

দোবেঠাকুর, নীরব। গৌরমণির কথা শুনিয়া তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতেছিল। কাজেই, গৌরমণির কটাক্ষে কথার উত্তর দিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল।

গৌরমণি, আবার বলিল,

"ঠাকুর, তোমার কোন ভয় নাই। এই চিঠিখানা দিবে মাত্র।"

গৌরমণি, একখানা চিঠি বাহির করিল।

আবার কটাক্ষ। কটাক্ষ করিয়াই দোবেঠাকুরকে যেভাবে চিঠিখানা দিতে হইবে, তাহা বেশ করিয়া বলিয়া দিল ; নানাপ্রকার বুঝপ্রবোধ দিয়া, নির্ভয়তা জন্মাইল। এই চিঠির কথা কোনরূপ প্রকাশ না হয়, তাহার জন্য বিশেষ করিয়া বলিল। চিঠিখানা দিতে পারিলেই সে

চিরদিনের নিমিত্ত, দোবেঠাকুরের হইবে; ইহাও বলিতে ত্রুটী করিল না।

তখন দোবেঠাকুর চিঠিখানা নিয়া, "রাম, রাম" বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:**:—

কর্ত্তব্য নির্ণয়।

প্রতুল ও গৌরমণি মুখামুখি বসিয়া, ইন্দুমতী ও নরেন্দ্রনাথের বিষয় ভাবিতেছিল। কি করিলে, ইন্দুমতী নরেন্দ্রনাথের বিরাগভাজন হইতে পারে, সেই চিন্তায় উভয়ে নিযুক্ত ছিল। গৌরমণির বাসনা পূরিয়াছে। প্রতুল, এখন তাহার প্রণয়ে পরিলিপ্ত হইয়াছে। গৌরমণিও প্রতুলের উপকার করিবার মানসে উৎকণ্ঠিত। প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়াছে, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—প্রাণ দিয়াও প্রতুলের আদেশ প্রতিপালন করিবে।

গৌরমণি, সেই দিন দোবেঠাকুরকে দিয়া একচাল চালিয়াছে। তাহাতে বড় বেশী সুফল হইবে না। তাই, মনে মনে হাজার হাজার মন্ত্রণা গড়িতেছে। গড়িয়া গড়িয়া, নিজেই আবার ভাঙ্গিতেছে। প্রকাশ্যে প্রতুলের নিকট কিছুই বলিতেছে না। প্রতুলও দুই একটী উপায়

উদ্ভাবন করিতেছে বটে, কিন্তু, গৌরমণির নিকট, সেই সমস্ত উপযুক্ত বলিয়া, বোধ হইতেছে না। পাপ কার্য্যে বাধা বিঘ্ন অনেক। গৌরমণি, কিছুতেই কিছু অবধারণ করিতে পারিতেছে না। তখন তাহার হৃদয় উদ্‌ভ্রমে বিলোড়িত হইয়া উঠিল। উদ্রিক্ত চিত্তবেগ বিলুপ্ত করিবার নিমিত্ত, নিজে নিজেই পরিহাস আরম্ভ করিল; এবং সহাস্যে প্রতুলকে লক্ষ্য করিয়া, বলিল,

"গাছ ভাঙ্গে বায়ুভরে।
মাটি নাহি চাহে ফিরে॥"

প্রতুল, কথা বলিতে বলিতে, অন্য দিকে চাহিয়া ছিল। গৌরমণি, কথায় কথায় শ্লোক বলিতে জানিত। প্রতুলকে অন্য দিকে চাহিতে দেখিয়াই উপরোক্ত শ্লোকটি বলিল। প্রতুল, গৌরমণির শ্লোক শুনিয়া, হাসিয়া উঠিল। বলিল,

"বেশ কবি, বেশ। এত রঙ্গ কোথায় শিখিলে?"

গৌরমণি, এবার আর শ্লোক দিল না। কেবল বলিল,

"তোমায় পেয়ে শিখেছি।"

প্রতুলও এবার গৌরমণির প্রতি বিদ্যুদ্দাম সদৃশ বিলোল কটাক্ষ করিল। এ অপাঙ্গ দৃষ্টি, গৌরমণির অন্তরের পরলে পরলে প্রবেশ করিল। তাহার আত্মবিভ্রম জন্মিল; স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে বুঝিতে পারিল না। পৃথিবী ছাড়িয়া যেন এমন কোন স্থানে গিয়াছে; যেখানে জগতের

সুখ দুঃখের, জ্বালা যন্ত্রণার, কোন সংশ্রব নাই। সেই রাজ্যে বিষাদ-লহরী খেলিতে পারে না; কেবল অনন্ত সুখ,—অনন্ত শান্তি। গৌরমণি, সেইখান হইতে ফিরিতে চাহিতেছে না। আকাঙ্ক্ষা, আজীবন সেই শান্তি সাগরে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু, নিরবচ্ছিন্ন সুখ, কাহার ভাগ্যে ঘটে না। এটি প্রাকৃতিক নিয়ম। গৌরমণিকে শীঘ্রই সেই সুখভ্রষ্ট হইতে হইল। তাহার মন তখন প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় প্রেম পিপাসায় প্রলুব্ধ হইল, কিন্তু, মুখ ফুটিয়া, প্রতুলের নিকট কিছু ব্যক্ত করিতে পারিল না। কেবল বাণবিদ্ধ জন্তুর ন্যায় যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল; বারংবার প্রতুলের পানে সোৎসুক লোচনে চাহিতে লাগিল। প্রতুল, অতি সহজে, গৌরমণির, মনোভাব বুঝিতে পারিল। আপনার অভিপ্রায় গোপন রাখিয়া, গৌরমণির আচরণ অবলোকন করিতে লাগিল। কিন্তু, প্রজ্বলিত অনল যেমন কাপড় দিয়া, আবৃত করিয়া রাখিতে পারা যায় না, তেমন গৌরমণির নিকটও প্রতুলের চতুরতা খাটিল না। গৌরমণি, অক্লেশেই প্রতুলের শঠতা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া প্রেমোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া, গাহিল,

সে ত এ হাসি ভালবাসে না;
ভাল দেখে না, ভাল বুঝে না।
তরুণ চাঁদের হাসি, দেখিতে সে অভিলাষী,

(জানি) বাসি ফুল আদর পায় না!
ছুঁতেও কি আছে, কারো মানা?

প্রতুল, গৌরমণির গাহিবার সময়, একটা ভাঙ্গা ধামা নিয়া, তালে বেতালে বাজাইতেছিল। প্রতুল, বাদ্য করিতে জানে না; তথাপি, গৌরমণির নিকট, সেই ধামার বাদ্যই সুমিষ্ট লাগিতেছিল। গৌরমণির উদ্দীপ্ত প্রেম-বহ্নি, গানের সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া আসিয়াছিল। গান সমাপ্ত হইলে পর, প্রতুল বলিল,

"গৌর, রাগ করেছ বুঝি?"

গৌরমণি, আহ্লাদের সহিত বলিল,

"কেন?"

প্রতুল। আমার বিশ্রী বাদ্য শুনে।

গৌরমণি। না। তোমার পরিষ্কার হাত, এ হাতের তুলনা হয় না! আমি কেমন গাই?

প্রতুল, কৌতুক করিয়া কহিল,

"ঠিক যেন শ্যামাদের বুধি গাই।"

গৌরমণির প্রতিবাসী—শ্যামাচরণ শিকদার। তাহার একটী বুধি নাম্নী গাভী ছিল। প্রতুল, গৌরমণির কথার পৃষ্ঠে রহস্য করিল। গৌরমণি, প্রতুলের এ বিদ্রূপে রাগিল না। বরং এই কথাগুলিকেই অমৃত তুল্য সুমধুর জ্ঞান করিল এবং খল্ খল্ করিয়া, হাসিতে লাগিল। কিছুকাল পরে, প্রতুল পুনরায় কহিল যে, এখন কি করা কর্ত্তব্য?

গৌরমণি, আবার চিন্তাস্রোতে পড়িল। ভাবিল, প্রতুলের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ না করিতে পারিলে; তাহাকে লইয়া, আজীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারিব না। ভাবিতে ভাবিতে সহসা, গৌরমণি হাসিয়া উঠিল।

প্রতুল, গৌরমণিকে হাসিতে দেখিয়া বলিল,

"গৌর, হাসিতেছ কেন?"

গৌরমণি, আনন্দে বিভোর হইয়া কহিল,

"ঠিক করিয়াছি।"

প্রতুল, ব্যগ্রতার সহিত বলিল,

"কি ঠিক করিলে?"

গৌরমণি। এখন সে কথা বলিব না।

প্রতুল, গৌরমণির কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, বড়ই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। গৌরমণি, প্রতুলকে দিয়া, একটী প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইবে, নিশ্চয় করিল। কিন্তু, তাহাও করিয়া উঠিতে পারিল না। গৌরমণি ভাবিল, প্রতিজ্ঞা করাইতে যাইয়া, যদি প্রতুলের মন ভাঙ্গিয়া যায়, তবে, সকল সুখে কণ্টক পড়িবে।

এই ভাবিয়া, গৌরমণি প্রতুলের কাণে কাণে মনস্থ উপায়টি বলিল। শুনিয়া প্রতুল বড়ই আনন্দ অনুভব করিল। বুঝিল, অভিলাষ পূর্ণ হইবে। মনে রাখিবেন, সেই দিন রাত্রিতে গৌরমণির বাড়ীতে, এই প্রতুলই আসিয়াছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পুনঃ পথিমাঝে।

গৌবমণি, বাড়ীব ঘাটে বসিয়া আছে। দেখিলে বোধ হয়, কাহাব নিমিত্ত যেন প্রতীক্ষা করিতেছে। বড উদ্বিগ্ন চিত্ত। প্রায়ই একটী লোক, গৌবমণিব বাড়ীব সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। অদ্য যাতায়াতেব সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তথাপিও লোকটি আসিতেছে না। সময অতীত দেখিয়া, গৌবমণি ভাবিল, লোকটি বুঝি আজ আব আসিবে না। আসিবাব হইলে, এতক্ষণ আসিত। আজ না আসুক, দুদিন পবও ত আসিবে; তখন গৌবমণির হাত ছাড়িয়া পলাইতে পারিবে না। এই ভাবিয়া, গৃহাভিমুখে গমন কবিল এবং যাইবাব সময় একবার পথেব পানে তাকাইল। দেখিল, লোকটি ঘোড়ায় চড়িয়া,

আসিতেছে। গৌবমণির আর বাড়ী যাওয়া হইল না। ফিরিয়া আসিয়া, পথেব পার্শ্বে, ভাল ভাবে দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে লোকটি, গৌবমণিব সন্নিকটে আসিয়া পড়িল। গৌবমণি, সসম্ভ্রমে নমস্কাব করিল। পবে, অত্যন্ত সলজ্জে ও বিনীত ভাবে কহিল,

"মহাবাজ! আমাব একটী কথা।"

নরেন্দ্রনাথ, ঘোড়া থামাইল। কহিল,

"কি কথা? বল।"

গৌবমণি তখন গৌর-চন্দ্রিকা আরম্ভ করিল। বলিল,

"মহাবাজ! আমরা ছোট লোক। আমাদেব কথা বিশ্বাস নাও করিতে পাবেন। কিন্তু, আমি মাটিতে পা দিয়া, ধর্ম্ম সাক্ষী কবিয়া, বলিতে পাবি, কদাচ মিথ্যা বলিব না। মিথ্যা বলিলে, আমাব মুখে যেন কুষ্ঠ বোগ হয়!"

নবেন্দ্রনাথ, এ সূচনায বড়ই বিবক্ত হইল। কহিল,

"তোমাব অন্য কিছু বলিবার থাকে ত বল। আমাব দবকাব আছে।"

গৌবমণিব মনে ভয়েব সঞ্চাব হইল। ভাবিল, কি বলিতে কি বলিযা ফেলিব। বলিযা কি শেষে জীবনটি হাবাইব? যখন বলিতে ইচ্ছুক হইযাছি, তখন নাই বা বলি কেমনে? এই ভাবিয়া. আতঙ্কে শিহবিযা উঠিল। গৌরমণির প্রাণ ধড়্ ফড়্ কবিতে লাগিল। জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আসিল; কথা বাহির হইল না।

নবেন্দ্রনাথ, পুনরায় কহিল,

"কৈ, বলিলে না ?"

এই বলিয়া, ঘাড় বাঁকা করিয়া শ্রবণার্থ কর্ণ পাতিয়া দিল।

গৌরমণি, আবার ভাবিল, প্রতুলের কার্য্য না করিলেই নয়। প্রাণ যায় সেও ভাল; তথাপি তাহার কার্য্য করিব। তাই চোখমুখ বুজিয়া, উপয্যুপরি কয়েকটি ঢোক গিলিয়া, চুপি চুপি নরেন্দ্রনাথের নিকট, কি জানি কি বলিল।

বলিবামাত্র, নবেন্দ্রনাথ, গৌরমণিকে সপা সপ্ করিয়া, কয়েকটি চাবুকের ঘা মারিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বেগে ঘোড়ায়ও কশাঘাত করিল। ঘোড়াটি কয়েকটি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বায়ুবেগে দৌড়িল। গৌরমণি, "উঃ গেলুম রে—বাবা রে" বলিয়া, চিৎকার করিতে করিতে বাড়ীতে চলিয়া গেল এবং ঘরের ভিতর যাইয়া, অর্গল দিয়া বসিল। বসিয়া বসিয়া, বারংবার আহত স্থান মার্জ্জনা করিতে লাগিল। গৌরমণির মনে তখন উদয় হইল, এ রোগের আর ঔষধ নাই। ব্রহ্মার ভাই স্বয়ং বিষ্ণু আসিলেও কিছু করিতে পারিবে না। আমি ত ছার গৌরমণি!! এখন প্রাণটি নিয়া পালাতে পারিলেই বাঁচি। পালাইবার সময়, প্রতুলের সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইব। প্রতুল কি আমার হাত ছাড়া হইবে? কি জানি? কাহার মনে কি আছে, কে বলিতে পারে?

নরেন্দ্রনাথ কিছুদূর আসিলে পর, গৌবমণির কথা সম্বন্ধে তাহাব মনে নানাপ্রকাব সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। একবাব ভাবিল, নাপিতিনী এমন কথা বলিল কেন? মিথ্যাকথা বলিলে যে, তাহার জীবনান্ত হইবে, সে কি তা জানে না? নাপিতিনী, কথনও ত আমার সহিত কথা কহে না। নিরর্থক মূলবিহীন কথা উঠিতে পারে না। অবশ্য ইহার ভিতর কিছু না কিছু নিগূঢ় অভিসন্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রতুলেব নামে বিপদ ডাকিয়া আনায়, নাপিতিনীর লাভ কি? আবাব ভাবিল, বৃক্ষে পোকা ধরিলেই লোকে টের পায! সামান্য বংশের, না কোন্ বংশেব একটা মেয়ে বিবাহ কবিযাছি; দুশ্চরিত্রা হইলেও হইতে পাবে, নিকৃষ্ট-বংশেব অধিকাংশ মেয়ে ছেলেই ভ্রষ্টা হইযা থাকে। তবে কি ইন্দুমতীও হীনবংশ সম্ভূতা? ছি! সামান্য গৌবমণিব কর্ণেও যথন কথাটা আসিযাছে; তথন নিশ্চযই ঘটনাটি প্রকৃত। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয নাই।

হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল; কি যেন তাহার মনে পড়িল। সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল; আবার ভাবিল, সেদিনও বৈঠকথানায, এ সম্বন্ধে একথানা চিঠি পাইয়াছি। কে যে চিঠিথানা দিযা গেল, এ পর্য্যন্ত কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। তাতেও ইন্দুমতী-সম্বন্ধে কত নিন্দা, কত কুৎসার কথাই লেখা ছিল। আমি তাহা

বাতুলের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি ; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, তাহা বাতুলের প্রলাপ নহে ; সত্য ঘটনা ! ভাল, ইন্দুমতী যদি সত্যই খাবাপ হইবে, তবে আমি কি কিছু বুঝিতে পাবিতাম না। সে পূর্ব্বেও যেমন ভালবাসিত এখনও তেমনি ভালবাসিতেছে। যে আমাকে একদণ্ড না দেখিলে, কেমন হইয়া যায়, তাহার প্রাণে যে কিছু দুবভিসন্ধি আছে, এমন ত বুঝিতে পারি না। ইন্দুমতীর মুখ দেখিলে, স্বর্গেব পবিত্র জিনিস বলিয়া জ্ঞান হয। হায় ! সেই নির্ম্মল পবিত্র জিনিস কলুষিত হইয়াছে ? আমি বিশ্বাস কবিব কেমনে ?

পাঠক ! নবেন্দ্রনাথ ইতিপুর্ব্বে যে চিঠিব কথা বলিল, সেই পত্র, দোবেঠাকুব, নরেন্দ্রনাথেব অলক্ষিতে বৈঠকখানায় রাখিযাছে। গৌবমণিব প্রলোভন-পবিপূর্ণ প্রেমেব খাতিবেই দোবেঠাকুরের এই গর্হিত কার্য্য ! ঘবেব ইন্দূবে যে বাঁধ কাটিযাছে, নরেন্দ্রনাথ, তাহা বুঝিবে কি প্রকাব ?

সহসা আবাব নরেন্দ্রনাথেব মনে প্রতুলেব পিতাব সহিত বিবোধেব কথা উদয হইল। আরও সন্দেহ বদ্ধমূল হইল ,—প্রতুল দুশ্চরিত্র বলিয়া। নরেন্দ্র, প্রতুলেব স্বভাব চবিত্রেব বিষয জানিত। কাজেই অসৎ উপাযে ইন্দুমতীকে কলঙ্কিত কবা অসম্ভব নহে। নবেন্দ্রনাথের মনে এসব সন্দেহেব উদ্রেক হওয়ামাত্র ঘোড়া হইতে লম্ফপ্রদান কবিল এবং হাঁটিয়া গৌরমণির গৃহাভিমুখে প্রধাবিত

হইল। সহিস্ কিছুদূরে ছিল, সে দেখিল, যেন নরেন্দ্রনাথ ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। তাই সে তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘোড়া ধরিল। পরে, ঘোড়া লইয়া নরেন্দ্রনাথের নিকটে আসিল। নরেন্দ্রনাথ সহিস্‌কেও দুইঘা চাবুক মারিল। সক্রোধে বলিল,

"ঘরমে লে যাও, শূয়র।"

সহিস্ তখন ঘোড়া লইয়া বাড়ী অভিমুখে ছুটিল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল, বাবুর মেজাজ আজ এত খারাপ হ'ল কেন? বাবু ত কখনও চাকর টাকরের প্রতি নিদয় ছিলেন না। না জানি ঐ মাগিই কি করিয়াছে। এই ত পথে আসিতে আসিতে বাবু কত দেলখোস্ মজাদারী কথা বলিতেছিলেন। নাপিতিনীর কাছে আসিযাই ত কি হইল। সহিসের রাগ তখন গৌরমণির উপর পড়িল। ঠিক করিল, সে তাহার ঘর পোড়াইযা দিবে। তখন সে ঘোড়া লইয়া বাড়ী আসিল, সেদিন ঘোড়ার ভাগ্যে আহার কিছু কম পড়িল।

নরেন্দ্রনাথ, গৌরমণির বাড়ীর নিকটে আসিল। আসিয়া ডাকিল, "গৌরমণি, গৌরমণি ও নাপিতিনী!" গৌরমণি নরেন্দ্রনাথের ডাক শ্রবণ করিয়া, ভীতচিত্তে গৃহের ভিতরস্থ নিভৃতস্থানে লুকাইল এবং ভাবিল যে, বুঝি তাহাকে ধরিতে আসিযাছে! এবার ধরিতে পারিলে, চাবুকের বাড়ী ত ভালই; প্রাণটি লইয়া টানাটানি

লাগিবে। কিন্তু গৌবমণিকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না; নবেন্দ্রনাথ, গৌবমণির গৃহের কপাটেব নিকট গেল। বলিল,

"গৌবমণি! আমি অপবাধ কবিয়াছি। দয়া কবিয়া আমাব একটী কথা শুনে যাও।"

গৌবমণি নিভৃতস্থানে থাকিযাই নবেন্দ্রনাথেব সমস্ত কথা শুনিতে পাইযা অনন্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ভাবিল, ঔষধ ধবিযাছে। বোগী সহজে কি তিক্ত ঔষধ খাইতে চাহে? জোব কবিযা খাওযাইযা দিতে হয়। ঔষধ পেটে গেলে ত অনন্ত ফল। গৌবমণি, ছল কবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘবেব বাহিব হইল। গৌবমণি, ঘবেব বাহির হওযামাত্র, নবেন্দ্রনাথ অতিশয় উৎকণ্ঠাব সহিত জিজ্ঞাসা করিল,

"তুই এসব জানিলি কি প্রকাবে?"

গৌরমণি, কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল,

"মহাবাজ আপনাবা বড়লোক—"

নরেন্দ্রনাথ, গৌবমণিব কথায় বাধা দিয়া, সক্রোধে কহিল,

"দেখ্ মাগী, তোর মহারাজ বেখে দে এখন। শীগ্‌গির যথার্থ কথা বল।"

গৌরমণি, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,

"সে সব কথা বলিতে লজ্জা করে।"

এই বলিয়া, কাপড়েব কিযদংশ মুখেব ভিতর গুঁজিয়া দিল। নরেন্দ্রনাথ ব্যগ্রতাব সহিত কহিল,

"বল মাগী, নৈলে তোব মাথা ভাঙ্গিব।"

নবেন্দ্রনাথ, গৌরমণিকে মুষ্টি দেখাইল এবং মনে মনে ভাবিল, গৌরমণিব বলিতে লজ্জা কবে। যে গৌবমণিকে সকলে ঘৃণা কবিয়া থাকে; সেই গৌবমণিও আজ আমাকে পরিহাস কবিতেছে। ছি! হয এ প্রাণ পবিত্যাগ করিব, না হয, ইন্দুমতীকে জন্মেব নিমিত্ত পবিবর্জ্জন করিয়া এই জঘন্য লোকাপবাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ কবিব।

গৌবমণি তখন সুযোগ পাইযা, ভয়ে ভযে, তাহাব কুটিল উদবে যত বিষ ছিল; একে একে, সমস্তই নবেন্দ্রনাথের পবিষ্কাব শ্রবণ বিবরে উদ্গীর্ণ কবিল। নবেন্দ্রনাথও গৌবমণিব সকল কথা, অভিনিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ কবিয়া, ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। গৌবমণি, নরেন্দ্রনাথেব ক্রোধ-বিকম্পিত কলেবব দেখিযা, দৃঢতাব সহিত নবেন্দ্রকে অনুবোধ করিল যে, সে ইহাব প্রত্যক্ষ প্রমাণও দিতে পাবে।

নবেন্দ্রনাথ, গৌবমণিব অকুতোভযতা অবলোকন কবিয়া, উদ্‌ভ্রান্ত মানসে ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, ছি! আমি সেই জঘন্য দৃশ্য দেখিব? তা হইবে না। ইন্দুমতী আমার অন্তবেব সর্ব্বস্ব। আমাব আঁধাব ঘবের আলো; সুখে শান্তি,—শোকে অশ্রু—প্রীতির প্রসূন; প্রেমের

পঙ্কজ; আমার সোহাগেব যাহা কিছু, সকলি সে আমার। যাহার পদ্মাভানন, ইহজগতে স্বর্গেব সম্পত্তি; যাহাব স্পর্শ সুখে, শবীর বিবশ বিকল হয়; যাহার কথা প্রসঙ্গ কর্ণকুহরে সুধা ঢালিয়া দেয়; যে আমাব আমি যাহাব বলিয়া, এ জীবন, এ সংসারে উৎসর্গ কবিয়াছি; হায়! কেমন করিয়া, তাহার বীভৎস্য দৃশ্য নিবীক্ষণ কবিব? কে জানে, পবিত্র অমৃতাশনে, গরল ভক্ষণ জনিত ফল উপভোগ করিতে হয়? কে জানে, কোকিলকণ্ঠে বিষ, ফুলে তববারি; তুষারে কলঙ্ক—পঙ্কজে কণ্টক! যদি থাকে—থাক্। জগতেব এ নিয়ম মানিব না; পিশাচেব এ অভিধান! কিন্তু সকলি সম্ভব—অসম্ভব!! তবুও অসম্ভব!!!

এ সকল ভাবিয়া, নবেন্দ্রনাথ, ঠিক কবিল—আর গৌবমণিব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিবে না। কিন্তু, আবাব কি জানি কি মনে উঠিল। ভাবিল, কলঙ্কপূর্ণ চন্দ্র কে না দেখে? কণ্টকিত মৃণাল ছানিযা, কে না মৃণালিনী তুলে? দেখিতে দোষ কি? দেখিব, কিন্তু এ প্রাণ থাকিতে আর স্পর্শ করিব না। পবিত্যাগ কবিব, লোকাপবাদ হইতে বিমুক্ত হইব; তবেই ত দর্শনজনিত অপবাধেব প্রায়শ্চিত্ত হইবে? পবে, প্রকাশ্যে ব্যাকুলভাবে বলিল,

"গৌব, তোর পাযে পড়ি, সত্য বল, আমাব প্রাণের ইন্দু কলঙ্কিনী হইয়াছে না কি? মিথ্যা বলিযা আমার মাথায় বজ্রপাত করিস্ না। ইন্দু ভিন্ন এ সংসারে আমার সুখ কি?"

নরেন্দ্রনাথ, গৌরমণির পায় ধরিবার প্রয়াস করিল এবং তাহার নয়নাশ্রু টস্ টস্ করিয়া পড়িতে লাগিল। গৌরমণি, ছি! ছি! করিয়া সরিয়া পড়িল, নরেন্দ্রনাথ আর পা ধরিতে পারিল না। কিন্তু, গৌরমণি দূরে সরিয়া মনে মনে কত হাসি হাসিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরে চাবুকের ঝাল তুলিবে ভাবিয়া বলিল,

"বাবু, আমরা গরিবলোক। আমাদের কথা বাসি হ'লে কার্য্যে লাগে।"

নরেন্দ্রনাথ, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,

"নাপিতিনী, তোর কথাই বিশ্বাস, কিন্তু, দেখিস্ তুই আমার সঙ্গে কুব্যবহার করিস্ না।"

গৌরমণি, আশ্চর্য্যভাবে কহিল,

"সে কি কথা? মুনিবের সঙ্গে কুব্যবহার, ধর্ম্ম কি নেই? কাল অনুগ্রহপূর্ব্বক আসিবেন, আমার কথা সত্য কি মিথ্যা সকলি জানিতে পারিবেন।"

নরেন্দ্র। কখন আসিব?

গৌর। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে।

নরেন্দ্র। ভাল, তাই হবে।

নরেন্দ্রনাথ তখন ভগ্ন-হৃদয়ে শিথিল পাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

গৌরমণির আনন্দ আর গায় ধরে না; গা বাহিয়া যেন হর্ষ ফাটিয়া পড়িতেছে। বুঝিল, এতদিনে তাহার সকল উদ্বেগের শান্তি বা উপশম হইবেক।

গৌরমণি ভাবিল, আমি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারি? সাগর ছেঁচে রতন তুলিতে পারি; কণ্টক ছানিয়া মৃণালিনী আনিতে পারি। তবে না পারি কি? আমার ক্ষমতা কত! এত ক্ষমতা একজন উকীল ব্যারিষ্টারেরও নাই। ক্ষমতা না থাকিলে কি, আজ বড় ঘরের জমিদার পুত্র গৌরমণির পায়ের কাছে কাঁদে? গৌরমণি কি একান্না নিবারণ করিতে পারে না? ইচ্ছা করিলে পাষাণের বুকেও স্নিগ্ধজল বাহির করিতে পারি; এ কান্নাতে হাসি ফুটাইতে পারি। তা করিব কেন? কে ইচ্ছা করিয়া আপন পায়ে

আপনি কণ্টক ফুটায়ে অচল হইয়া থাকিতে চায়? সকলেই নিজের সুখেব নিমিত্ত পাগল; তবে আমি যে পাগল হ'ব না, কে তোমায বলিল? নিজেব সুখেব পথে কাঁটা দিয়া, কে অন্যেব উপকাব কবিয়া থাকে? যে নিজেব সুখ স্বচ্ছন্দতা চায না, সে ত জগৎছাড়া লোক। পবোপকাব করিয়া সে না হয় চিনির বোঝা বহিবে, আব আমি না হব নিজেব সুখভোগ কবিয়া চিটেগুড় টানিব। কিন্তু, এটি জানিও দুজনেই সমান। গাধাযও চিনিব মর্ম্ম বুঝিবে না, আব আমি ত আমিই! ইহাব জন্য ভাবনা কম। ভাল জিজ্ঞাসা কবি, এটা কি খাবাপ কাজ? পোড়াবমুখগুলি হয় ত বলিবে খারাপ বৈ কি? বলি, তাহাবা কি চোখ খেয়ে বসে আছে যে, আপন স্বভাব দেখে না—বুঝেও না। জান ত লোকেব ভিন্ন ভিন্ন অভিরুচি! যাহাব যাহাতে রুচি, সে সেই প্রকার চলা ফিরা কবিয়া থাকে। এতে দোষ কি? যে বিভিন্ন রুচি দেখিতে পাবে না, তাহাব চোখ কাণ বুজাইযা বাখাই উচিত।

এই প্রকাব গৌরমণি ভাবিতেছে; এমন সময নরেন্দ্রনাথ আসিয়া, গৌবমণিব বাটীতে উপনীত হইল। তখন সন্ধ্যা হয হয়। সেই সময়, গৌবমণি গৃহেব মেঝ ঝাড়িতেছিল। গৌরমণি, গৃহঝাড়া স্থগিত বাখিয়া, নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া, তাহাদেব খিডকীর বাগানের অভিমুখে গমন কবিল। ক্রমে ক্রমে উভয়ে বাগানের সন্নিকটে

আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌরমণি তখন নরেন্দ্রনাথকে, প্রাচীরের ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া, বাগানের ভিতর চাহিয়া থাকিতে বলিল। খিড়কীর বাগান, ইষ্টক নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের গায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে। নরেন্দ্রনাথ, গৌরমণির কথানুসারে, উৎসুকচিত্তে প্রাচীরস্থ ছিদ্রপথে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎকাল পরে দেখিল, একটী লোক লতাকুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ পরই, সেইখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া; একটী ফুলের লতার সহিত, একখানা চিঠি বাঁধিয়া রাখিল। খিড়কীর বাগানে, একটী লতাকুঞ্জ ছিল। নরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক এই লতাকুঞ্জটী অনেক যত্নে প্রস্তুত হইয়াছে। লোকটি, তাড়াতাড়ি পত্র বাঁধিয়াই বাগানের বাহির হইয়া গেল। নরেন্দ্র, লোকটিকে চিনিল।

দৈবাধিন, ইন্দুমতীও ঠিক সেই সময় কিঞ্চিৎ তফাতে, অন্যদিকে চাহিয়া, বাগানের ভিতর ফুল তুলিতেছিল। এ সকল, নরেন্দ্রনাথ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিল। দেখিয়া, নরেন্দ্রনাথের শরীর ক্রোধে বায়ু বিতাড়িত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। লোকটি যে তাহার সম্মুখ দিয়া পলায়ন করিল, তথাপি তাহাতে ফিরিয়াও চাহিল না। কেবল ধীরে ধীরে, ইন্দুমতীর অগোচরে বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল এবং লোকটির আবদ্ধ কাগজ খণ্ড খুলিয়া আনিল। ইন্দুমতী, এসমস্ত কিছুই জানিতে পারিল

না। নবেন্দ্রনাথ, কাগজখণ্ড নিয়া, বাগানের বাহিরে আসিয়া পড়িল। পরে, চিঠিখানা পড়িল ঃ—

"ইন্দু,

পরম্পর শুনিতে পাইলাম, আমাদের গুপ্ত প্রণয় ঘটিত কথা, তোমার স্বামী জানিতে পারিয়াছে এবং প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। তাই আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য মনস্থ করিযাছি ; কিছুদিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। পারি যদি তবে পত্র দ্বারাই মনোভাব জানাইব। এখন আসি।"

তোমারি প্রণয় পীযূষ পিপাসু

প্রতুল।

পত্র পড়িযা, নবেন্দ্রনাথের ক্রোধ আরও বাড়িল।

মধ্যাহ্ন সময়ে, গৌরমণি প্রতুলকে বায়েদের খিড়কীর বাগানে রাখিয়া গিয়াছিল। কি ভাবে রাখিয়া গিযাছিল ; তাহা কেহই বলিতে পারে না। কারণ, সেই সময় সকলেই খাওয়া দাওয়ায় বিব্রত ছিল। কাজেই, কেহই প্রতুলের প্রবেশ জানিতে পারে নাই। সন্ধ্যার সময়, ইন্দুমতী বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছিল। প্রত্যহই ইন্দুমতী সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাগানে পরিভ্রমণ করিতে আসিযা থাকে। আজিও আসিয়াছে। ভ্রমণ করিতে করিতে দুই চারিটি ফুল তুলিতেছিল এবং এক ঐকটী ফুলগাছের

নিকট বসিয়া বসিয়া, ফুল গাছের মূলজাত তৃণাদি তুলিয়া ফেলিতেছিল। কাজেই ইন্দুমতী, প্রতুল কি করিল না করিল, তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না।

নরেন্দ্রনাথ, কিন্তু প্রতুলের পত্র পড়িয়া এবং প্রতুলকে লতাকুঞ্জ প্রভৃতিতে যাইতে দেখিয়া, বিষম সন্দেহ করিল। মনে মনে ঠিক করিল—গৌরমণি যথার্থ কথাই বলিয়াছে। ঘৃণায় অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া, নরেন্দ্রনাথ, পত্রখণ্ড হাতে করিয়া, সক্রোধে চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শয়ন কক্ষে।

নবেন্দ্রনাথ, খিড়কীর বাগান হইতে, একবারে শয়ন কক্ষে আসিল। আসিয়াই ইন্দুমতীকে দেখিতে পাইল। ইন্দুমতীও তখন বাগানের ফুল নিয়া আসিয়াছে মাত্র। নবেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীকে দেখিয়াই ক্রোধে জলিয়া উঠিল। ইহার মুহূর্ত্তপূর্ব্বে, সে ইন্দুকে অবলোকন করিলে, নবেন্দ্রের শরীরে প্রেমের তাড়িত ছুটিত, হৃদয়ে সুখের সাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, এখন সেই ইন্দুমতীকে বিলোকন করিয়া, ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করিল। নবেন্দ্রনাথ, এখন ঘোর উন্মত্ত! ভাল মন্দ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য!

ইন্দুমতীকে দেখিয়া, কি যেন বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু, আবেগের আতিশয্যে—ঘৃণার প্রভূত তাড়নায়, কথাগুলি কোন মতেই ওষ্ঠের যবনিকা ভেদ করিতে পারিল না। কেবল রক্ত অক্ষি গোলক ঘুরিতে লাগিল; চক্ষু কপালে উঠিল; মুখে যেন মরণের ছায়া পতিত হইল।

ইন্দুমতী, তাহার নরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া রহিল—অনিমিষলোচনে চাহিয়া রহিল। দেখিল, এমুখ যেন সেই মুখ নহে,—চাঁদমুখ যেন মেঘে ঢাকিয়াছে। ইন্দুমতী, সেই বজ্রবিদ্যুৎগর্ভ মেঘখণ্ডের মত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া, কাঁপিয়া উঠিল।

যদি সেই মুহূর্ত্তে, ইন্দুমতীর মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত, অথবা, প্রাণ বিয়োগ হইত, তাহাতে যত ক্লেশ না জন্মিত, নরেন্দ্রনাথের এমূর্ত্তি দেখিয়া, ইন্দুমতীর ততোধিক কষ্ট হইতে লাগিল। ভাবিল, সে যেন আর এজগতে নাই—এজগত যেন আর তাহার নয়; আজ সে ভিখারিণী। জগতে সে একা—একটু দাঁড়াইবার জায়গা নাই, যেখানে দাঁড়ায়, সেইখানেই কত কি স্বপ্ন দেখে—স্মৃতির শ্মশান দেখিয়া, শিহরিয়া উঠে। এ শ্মশান ভূমিতে সে একা—চারিদিকে কঙ্কালের রাশি; কে তাহাকে এ মহাশ্মশান হইতে, শীতল কুটীরে লইয়া যাইবে?—নরেন্দ্রনাথ? ইন্দুমতী, আবার নরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল। দেখিল, এখনও নরেন্দ্রনাথের চোখে আগুণ জ্বলিতেছে—ধক্ ধক্ ধক্! ইন্দুর কুটীর পুড়িয়া গেল! ইন্দু, কাঁদিল,—ইন্দুমতী আজ ভিখারিণী!!!

ভিখারিণী, আশ্রয়ের জন্য, নরেন্দ্রনাথের মুখপানে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল। ঐ মুখই তাহার চিরশান্তি নিকেতন—আশা ভরসার মঞ্চ। আর কোথায় যাইবে?

যাইবার স্থান থাকিলে ত? তাই আবার চাহিল—কত কি ভাবিল—কথা ত ফুটিল না, বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল! এবার ইন্দুমতী যেন প্রলয়ের জলে ভাসিতে লাগিল; তাহার বড় সাধের তরী যেন ডুবিয়া গেল; তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে হইতে যেন কোথায় ভাসিয়া চলিল; ভীষণ আবর্ত্ত—আর রক্ষা নাই। ইন্দুমতী চমকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ডাকিল,—

"পরমেশ্বর!—প্রাণেশ্বর!!"

ডাকিযাই মূর্চ্ছিত হইয়া, নরেন্দ্রনাথের পদতলে পড়িয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ, সক্রোধে সোণার প্রতিমাকে সজোরে পদাঘাত করিল। ইন্দুমতী, বাত্যা বিতাড়িত ব্রততীর মত, ধূলায় গড়া গড়ি যাইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ, এ দৃশ্য আর দেখিতে পারিল না। চোখ দুটি বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং অনিমিষলোচনে ধূলি বিলুণ্ঠিত মস্তকখানি দেখিতে লাগিল। দেখিল, সেই শুভ্র ললাট; সেই সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল, সেই কুঞ্চিতকৃষ্ণকেশপাশ, সেই বাসন্তি গোলাপ তুল্য প্রফুল্ল গণ্ডস্থল। আরও দেখিল, সেই সরলতা, সেই মাধুর্য্য, সেই স্নেহ, সেই করুণা, সকলি যেন মুখমণ্ডলে জাগিয়া রহিয়াছে; আর সেই ওষ্ঠাধরে, এখনও ব্রীড়া মাখা প্রেমটুকু লাগিয়া আছে।

নরেন্দ্রনাথ, পাগলের মত, সেই ওষ্ঠাধর চুম্বন করিল

এবং ইন্দুমতীকে আবার ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। পরে, কত কি প্রলাপ বকিতে লাগিল। ইন্দু, তুই আমার কত আদরের, কত স্নেহের, আমার সোহাগের সার, ভালবাসার ভিত্তি; প্রেমের প্রসূন—আ! প্রসূনে কীট? এও কি সত্য? আমার কুঞ্জের কোকিল, আমার পিঞ্জিরার কোকিল—কোকিল! কলঙ্কের কোকিল! কাল কোকিল! কেন পিঞ্জিরায় পূরিলাম? কেন পুষিলাম? কেন মজিলাম? আর না!—এমূর্ত্তি কেন এতদিন দেখি নাই?

এই ভাবিতে ভাবিতে, প্রতুলের চিঠির কথা, বৃশ্চিক দংশনের মত, নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। পরে, উন্মাদের ন্যায় চীৎকার দিয়া কহিল,

"পিশাচী, রাক্ষসী, বিশ্বাসঘাতিনী—যাও। আর এ গৃহ কলুষিত করিও না।"

এই বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ, ক্রোড় হইতে ইন্দুমতীকে ভূমিতে ফেলিয়া দিল এবং প্রতুলের চিঠিখানা, ইন্দুমতীর গাত্রে ছুড়িয়া মারিল। পত্রখানি ছুড়িয়া মারিয়াই, নরেন্দ্রনাথ, সবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃঃ০—

গৃহ পরিত্যাগ।

ইন্দুমতীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। দেখিল, নরেন্দ্রনাথ, শয়নকক্ষে নাই। শুধু একখানা পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। ইন্দুমতী, সেখানা, নরেন্দ্রনাথের পত্র ভাবিয়া, কুড়াইয়া লইল। পড়িল। পড়িয়া জানিল, পত্রখণ্ড নরেন্দ্রের নহে। অমনি ঘৃণায় দূরে নিক্ষেপ করিল। তখন, নরেন্দ্রনাথের কঠোর রাগের কারণ বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া ইন্দুর কি হইল? আর কি হইবে? বুক ফাটিয়া, দুইখণ্ড হইয়া যাইতে লাগিল; সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল; ইন্দুমতীর আয়তবিস্ফারিতলোচনযুগল বর্ষাবারিনিষিক্তকুসুম কোরকের ন্যায় অশ্রুপূর্ণ হইল।

তখন ইন্দুমতী ভাবিল, তিনি আমায় অবিশ্বাস করিয়াছেন—কলঙ্কিনী ভাবিয়াছেন। এ অবস্থায়, আর এমুখ দেখাব কি প্রকারে? দেবতার প্রাণে কষ্ট ও যাতনা

দিতে, আমার জন্ম হয নাই। আমি থাকিলে, তাঁহার পবিত্র বংশ, পবিত্র নাম ও পবিত্র গৃহ কলুষিত হইবে। লোক লজ্জা ভয়ে বা ঘৃণায, আমাকে স্পর্শও কবিবেন না। যদি দেবতাব পাদপদ্মই পূজা কবিতে না পাবিলাম; তবে আব এ প্রাণেব লাভ কি? ববং এ প্রাণ পবিত্যাগ কবিব। জগতের কাহাকেও আব এমুখ দেখাইব না। যে মুখ দেখিয়া, স্বামীব প্রাণে কষ্ট হয়, সেই মুখ কি দেখাইতে আছে? কিন্তু, দুঃখ এই—তিনি আমাকে বিনা অপবাধে, বিনা দোষে পবিত্যাগ কবিলেন, অবিশ্বাসিনী, বাক্ষসী বলিয়া পাযে ঠেলিলেন। বোধ হয, ইন্দমতী, নবেন্দ্রনাথেব কথাগুলি, শুনিযাছিল।

এই ভাবিতে ভাবিতে, ইন্দমতীব নয়নে প্রবল বাবিধাবা, গঙ্গাস্রোতেব ন্যায বহিতে লাগিল। আবাব ভাবিল, আমি সকল দুঃখ, সকল যাতনা সহিতে পারিব, কিন্তু, মিথ্যা দোষাবোপ জনিত দুঃখ সহিতে পাবিব না। হায়! এ হতভাগিনীব কেন মৃত্যু হয় না? মবিতে পারিলে, সকল যন্ত্রণাব দায় হইতে বিমুক্ত হইতে পাবিতাম। আমি পোড়াকপালি; কাহাব এত জোর কপাল, এমন স্বামী রত্ন পাইবে? সুতপস্যায়, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পূণ্যফলে পাইয়াছিলাম; ভাগ্য দোষে, সে সুখেব পথে কণ্টক পডিল। আমি ভিখারিণী; আমার কেন বাজবাণী তুল্য ভাগ্য হইবে? এ দুঃখ হইতে, আমাব মবণ ভাল।

অনেকেই কষ্টে পড়িয়া, মরিতে অভিলাষ কবে বটে, কিন্তু মবে কয় জনে? বস্তুত ইন্দুমতী এখন মবিতে পাবিলে নিশ্চয়ই মবিত। ইন্দুমতীব চিত্ত, এখন স্থিব গম্ভীব, নির্ব্বিকাব, নাই কান্না, নাই হাসি, নাই হর্ষ, নাই বিষাদ, কেমন যেন জড়বৎ হইয়া গিযাছে। ইন্দুমতী তখন আপন মনে গদ গদ ভাবে, নবেন্দ্রকে উল্লেখ কবিযা, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল। কহিল,

"নাথ, তুমি আমাকে বিনা অপবাধে পবিত্যাগ কবিতেছ, ভালই। তোমাকে দুঃখ দিতে, এখানে আর থাকিব না। কিন্তু, এই বিনীত আকাঙ্ক্ষা—ইহজন্মে হউক, পবজন্মে হউক, অথবা শত সহস্র জন্মান্তবেও যদি এপাপ বিমুক্ত হয়, তবে, দয়া কবিযা, পুনবায এ দাসীকে গ্রহণ কবিও। মনে বড আশা ছিল, যাবাবকালে তোমাব মুখে একটী হাসি দেখে ও কথা শুনে যাব, কিন্তু কর্ম্ম দোষে, তাতেও বঞ্চিত হইলাম। এই দুঃখ বহিল।"

এই বলিয়া, নবেন্দ্রনাথেব উদ্দেশ্যে প্রণিপাত কবিল। পবে মনেব খেদে, গৃহ পবিত্যাগ কবিযা, চলিযা গেল।



ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—◦—

অন্বেষণ।

রায়বাড়ীতে তুমুল হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে—ইন্দুমতী নাই, শৈলবালা নাই; দুজনার একজনও নাই। গিন্নী, এঘর ওঘর করিয়া, অন্দরমহলের সমস্ত ঘরগুলি খুঁজিতেছেন। কিন্তু কোথায়ও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। না পাইয়া, শিরে করাঘাত করিতেছেন—কাঁদিতেছেন। কর্ত্তা, উৎকণ্ঠিত চিত্তে, একবার বাহিরবাড়ী, আবার অন্দরমহলে আসিতেছেন—যাইতেছেন। ক্ষেত্রমণি, চিন্তামণি, রামমণি, রাসমণি, সখিমণি প্রভৃতি দাসী মাগীগুলি, অন্দরমহলের চারিদিকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া, পরিশ্রান্তা হইতেছে। কিন্তু, কেহই ইন্দুমতীকে, কি শৈলবালাকে অন্বেষণ করিয়া, পাইতেছে না।

রায়বাড়ীর যত আমলা; গোমস্তা, কর্ম্মচারী, পাড়েঠাকুর প্রভৃতি সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে ইন্দুমতীর

অন্বেষণার্থ, গ্রামের ভিতর ইতস্তত ছুটিতেছেন—তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতেছেন। কর্ত্তা, প্রজাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিয়া দিলেন যে, যে প্রজা ইন্দুমতীকে আনিতে পারিবে, কি তাহার কোন খোঁজ খবর বলিতে পারিবে, সে নিষ্করে দশ বছর বাস করিতে পারিবেক। কর্ত্তা, ইহাও প্রচার করিলেন যে, যে কেহ ইন্দুমতীর সংবাদ দিতে পারিবে, তাহাকে যথেষ্ট পারিতোষিকও প্রদান করিবেন। প্রজা মহলে, প্রজাদের পুরস্কারের কথা বাহুল্যরূপে প্রচারিত হইল। এক প্রজার মুখে, অন্য প্রজায়, অন্য প্রজার মুখে আবার আর এক প্রজায়, পুরস্কারের কথা শুনিতে লাগিল। প্রজারা তখন আনন্দোৎফুল্ল হইয়া, অমনি যে যাহার হাল, লাঙ্গল, গরু বাছুর ফেলিয়া রাখিয়া, ইন্দুমতীর অন্বেষণার্থ বাহির হইল। প্রজারা কিন্তু কেহই ইন্দুমতীকে চিনে না। কাজেই, তাহাদের অতি বড় আশা যে বিফল হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

পাড়ার বৌ ঝিরা, পুরস্কারের আশায়, আপন আপন শয়ন মন্দিরের নিভৃতস্থান সমূহ উপর্য্যুপরি খুঁজিতে লাগিলেন। যাঁহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস যে, তিনিই পুরস্কার পাইবেন, তিনি যে কতবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজিলেন; তাহার ইয়ত্তা নাই। বৌদের মধ্যে কেহ ভাবিলেন, যদি তাহার শয়ন ঘরে ইন্দুমতীকে পাইতে পারেন, তবে লব্ধ পুরস্কার দিয়া, তিনি, তাহার বোন দিদির বড় ছেলের

খোকাবাবুকে একটী চিনেব পুতুল কিনিয়া দিবেন। পুতুলটি কত ছোট হইবে?

মেয়েবাও ভাবিল যে, যদি কোথায়ও ইন্দুমতীকে পাইতে পাবে, কি খুঁজিয়া বাহিব কবিতে পাবে, তবে, তাহাবাও পুবস্কাবেব কিঞ্চিৎ দিযা, সইকে এক জোড়া কাশ্মীবি চুড়ি কিনিয়া দিবে। কিন্তু, তাহাদেব কাহাবও অদৃষ্টে পুবস্কাব ঘটিল না। এতে বৌবা ও মেয়েরা ভাবী দুঃখিত হইলেন। আমবা বলি, অনুশোচনায় ফল কি? ববং নিজ নিজ তেল সিন্দুবেব বাক্স হইতে দুচাবি পযসা ব্যয কবিযা, অভিলাষ পবিপূর্ণ করুন। তাহাতে আত্মমর্য্যাদাও আছে। এটি কি ভাল পবামর্শ নহে?

গ্রামময ইন্দুমতীব পলাযন বার্ত্তা বাষ্ট্র হইযাছে। নীচবংশীয কতকগুলি স্ত্রীলোক কক্ষে জলকুম্ভ নিযা, জল আনিতে যাইতেছিল। তাহাবাও এ সংবাদ শুনিযাছিল। পথিমাঝে, একে অন্যকে কহিল,

"দিদি, শুনেছিস্; বাযেদেব বৌ নাকি পালিয়ে গেছে?"

অপরা, বিস্মিতভাবে কহিল,

"বলিস্ কি, বোন? বলিস্ কি? তুই কাহাব মুখে শুন্‌লি?"

তৃতীযা আব একটি বমণী মুখ বিকৃত কবিয়া, "নথ" ঝাড়া দিযা, নিজের সতীত্ব প্রকাশার্থ কহিল,

"যা, বোন, যা ; ওকথা আর তুলিস্‌নে। আমরা হ'লে গলায় দড়ি দিয়ে মত্তেম। এমন ঘরের বৌ—"

এরপর, কয়েকটি কি কথা জানি, প্রথমা ও দ্বিতীয়ার কাণে কাণে বলিল। স্ত্রীলোকের স্বভাব,—জানুক আর নাই জানুক, তিলকে তাল বানান। সত্য বলিতে যেন তাহাদের মুণ্ডপাত হয়। এ স্ত্রীলোকটিও যতদূর বাড়াইয়া বলিতে হয়; বলিতে ত্রুটি করিল না।

তখন দ্বিতীয়া রমণী, আশ্চর্য্যভাবে বলিল,

"ছি। ছি। ঘেন্না। ঘেন্না। এমন কাযও মেয়ে লোকে করে? তুই কি করে জান্‌লি, বোন?"

তৃতীয়া। কেন? কাল রাত্রিতে মিন্সে বলেছে। বোন, বড় লোকের বৌ হ'লেই হয় না। স্বভাব দোষ ছাড়িবে কি প্রকারে? ঐ যে কথায় বলে,

ভাঙ্গা কুলায় ফেলে ছাই।
গোয়াল ঘরে থাকে গাই॥

যাহার যেমন স্বভাব, তাহার তেমন কার্য্য। কোন ঘরের, না কোন ঘরের একটা মেয়ে আনিয়া, জমিদার বাবুর এত অপমান। দেশ শুদ্ধ লোকে, এ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন, সেই নিষেধ শুনিলেন না। এখন কেমন তাহার ফল হইল? জমিদার মানুষ, যা করে, তাই শোভা পায়! আমরা হইলে এতদিন একঘরে হয়ে থাক্‌তেম।

এই বিষয় লইয়া, তাহারা হাস্য পরিহাস করিতে

করিতে চলিয়া গেল। মিন্সের দোহাই দিয়া, স্ত্রীলোকটি যাহা বলিল; প্রকৃতপক্ষে, তাহার স্বামী, এবিষয় কিছু জানেও না, অথবা বলেও নাই। অন্যান্য স্ত্রীলোকগুলির বিশ্বাস জন্মানের নিমিত্ত, মিন্সের দোহাই দেওয়া হইয়াছে। কোন কথা বলিয়া, স্বামীর নাম ব্যতীত, স্ত্রীলোকের পরিত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই। ধন্য, রমণীকূলে!

অকস্মাৎ আবার একটা তুমুল গণ্ডগোল পড়িয়া গেল,—বৌ আসিতেছে, বৌ আসিতেছে। সকলের মুখেই ঐ এককথা—বৌ আসিতেছে। কর্ত্তামহাশয় ত এসংবাদ পাইয়াই মহোল্লাসে, তাড়াতাড়ি, বাড়ীর সদর রাস্তার অগ্রভাগে আসিলেন। আসিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কোথায়ও বৌ আসিবার লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। কিছুকাল পরে দেখিলেন, একখানা পাল্কীর পশ্চাতে পশ্চাতে, একটা লোক খুব বেগে দৌড়িয়া আসিতেছে। রায়মহাশয় তখন ঠিক করিলেন যে, এই পাল্কীতেই হয়ত বৌ আসিতেছে। কর্ত্তার কর্ম্মচারী মহাশয়গণও কর্ত্তার মতেই মত দিলেন এবং পাল্কীর অপেক্ষায় সকলে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আনন্দে সকলেই বিভোর।

দেখিতে দেখিতে পাল্কীখানা, সদর রাস্তার অগ্রভাগ দিয়া, অন্যপথে চলিয়া গেল। পাল্কীর সঙ্গীকে, একজন কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় যাইবে?

সঙ্গী উত্তর করিল যে, তার মাতার বড কঠিন ব্যারাম, তাই, শ্বশুর বাড়ী হইতে স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছে। সকলের বিশ্বাস ছিল, লোকটী রায়বাড়ী চিনে না বলিয়াই, বৌকে অন্যপথে লইয়া যাইতেছে। কিন্তু সঙ্গীর ব্যক্তির উত্তর শুনিয়া, সে অন্ধবিশ্বাস বিদূরিত হইল। সকল আশা ভরসা ফুরাইল। কর্ত্তার হরিষে বিষাদ জন্মিল।

সেইখানে কতকগুলি বালক দণ্ডায়মান ছিল। যখন দেখিল যে, এ বৌ রায়েদের বাড়ীর নহে, তখন বালকের দল পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। পরে, হাততালি দিতে দিতে স্বর তুলিয়া, বলিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল,

"কলা গাছে, ঢোঁড়াসাপ।
পাল্কের বেটা বোর বাপ॥"

কেহ কেহ বলিল,

"কাঁধের বাঁশে পড়িল বাড়ি।
বৌ দিয়ে যাও আমার বাড়ী॥"

কেহ কেহ আবার পাল্কীর বাহকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল,

"হাতে লাঠি কাঁধে বাঁশ।
মাগীর ঘোড়া কৈ যাস্?"

এদিকে অন্বেষণ-কারীরা, সকলেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া একে একে বাড়ীতে ফিরিতে লাগিল। কেহই ইন্দুমতী কি শৈলবালার খোঁজ করিতে পারিল না। এমনকি সামান্য একটু সংবাদও কোথায় জানিতে সক্ষম হইল না। কর্ত্তা, এ সমস্ত শুনিয়া, বিরসবদনে বসিয়া বসিয়া, অনুতাপ করিতে লাগিলেন।



বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

শূন্যগৃহে।

নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীর গৃহ-পরিত্যাগের পর, দশ পনর দিন পর্য্যন্ত শয়ন-মন্দিরে আসে না। অদ্য কেন যে আসিল, বলিতে পারি না। শয়নকক্ষে আসিয়াই কিয়ৎকাল কাঁদিল। কাঁদিয়া শেষে, উন্মত্তবৎ ইন্দুমতীর যত আদরের সামগ্রী ছিল; সেই সকল ভাঙ্গিতে লাগিল।

ইন্দুমতীর অতীব আদরের একটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত পানের ডিবা ছিল, নরেন্দ্রনাথ, অগ্রে সেটি আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিল। পরে ইন্দুর চিরুণী, আয়না, ফুলালতেলের শিশি, কাচের গ্লাস, উৎকৃষ্ট কাচের ডিস, একে একে সকলই ভাঙ্গিল। তারপর, ইন্দুমতী যে, নিজে উল দিয়া, অতি পরিপাটী করিয়া, বড় বড় দুটি রাজপাখী আঁকিয়াছিল এবং নরেন্দ্রনাথই পাখী দুটিকে অতি সযতনে স্বর্ণ-নির্ম্মিত ফ্রেমে বাঁধাইয়া আনিয়াছিল, সেই পাখী দুটি খুলিল, গ্লাস,

ফ্রেম প্রভৃতি ভাঙ্গিল। অবশেষে পাখী দুটির মাথার উপর যে লেখা ছিল,—

"আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা—
নরেন্দ্রনাথ রায়কে উপহার দিলাম।"

সেই লেখাগুলি ও সেই সর্ব্বজন প্রশংসিত পাখী দুটিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, ছিন্নভিন্ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ছিঁড়িতে পারিল না। ছিঁড়িতে না পারিয়া, পদতলে বিদলিত করিল। পাখী দুটির সুশ্রী বিলুপ্ত হইল। ঐ সঙ্গে সঙ্গে রচয়িত্রীরও গুণপনা চিরদিনের জন্য বিলোপ হইল। নরেন্দ্রনাথ! এমনি করিয়া কি পদে দলিতে হয়? ছি!

ইহার পর, নরেন্দ্রনাথ যে পালঙ্কে শয়ন করিত, সেই খাটখানা উল্টাইয়া ফেলিল এবং তদুপরি বসিয়া ভাবিতে লাগিল। প্রথমে ভাবিল, ইন্দুমতীর সেই শরদিন্দু নিভানন, ইন্দুর স্পর্শ সুখ—ইন্দুর পীযূষ পরিমিশ্রিত কথা। পরে ভাবিল, হায়! আমি রতন চিনিলাম না কেন? আমার এমন দিব্যচক্ষু থাকিতেও অবহেলায় দুষ্প্রাপ্য মাণিক বিনষ্ট করিলাম! আমি বানর, রত্নের মর্ম্ম কি বুঝিব? না জানি ইন্দুমতী যাইবার কালে, আমাকে দেখিবার জন্য কত কাঁদিয়াছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ কত স্ফীত করিয়াছে? আমি কঠিন, পাষাণ সমান নিষ্ঠুর! আমার বিবেকশক্তি নাই—আমি নর-পিশাচ! পিশাচের সহিত স্বর্গীয় দেবীর মিলন হইবে কেন?

এই ভাবিয়া, নরেন্দ্রনাথ, সহসা একটি লম্ফ দিয়া উঠিল এবং নিজে নিজেই অস্ফুটভাবে বলিতে লাগিল। বলিল, কি? কি? আমি নরেন্দ্র, ইন্দুমতীকে পদাঘাত করিয়াছি? অসম্ভব! এখনও এতদূর নিষ্ঠুর হই নাই। হইয়াছি—যখন ইন্দুমতীকে গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি; তখন আমার অসাধ্য কিছুই নাই! আমি সকলি করিতে পারি। চুরি বল, ডাকাতি বল, খুন বল, পৃথিবীর যাবতীয় পাপ ও ঘৃণিত কার্য্য সকলি আমার দ্বারা সুসাধিত হইতে পারে। যাহার ভাল মন্দ, হিতাহিত জ্ঞান নাই; সে কি মানুষ? কি কষ্ট! কিছুদিন যেতে না যেতেই, আমার হৃদয়টা শূন্য শূন্য বলিয়া, অনুভব হইতেছে কেন? আঁধার ঘরে লোক থাকা সত্ত্বেও যেমন কেহ নাই বলিয়া, প্রতীত হয়, তেমনি যেন প্রাণটা করিতেছে। বোধ হয়, আমার কি যেন নাই। যার বলে এতদিন বলশালী ছিলাম, এখন যেন সেই জিনিসটি নাই। সেই জিনিসটি থাকিলে বুঝি প্রাণ দূর দূর করিত না এবং উদাস্ উদাস্ অনুমান হইত না। এ গৃহ কি ছিল, এখন কি হইয়াছে? ইন্দুমতীর গৃহ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে, গৃহটিও যেন কুৎসিত হইয়া গিয়াছে। যার ধন সে যত্ন না করিলে, কে করিবে? অন্যে শত সহস্র করিলেও নিজের মত হয় কি?

তখন নরেন্দ্রনাথ, উন্মত্তভাবে জানালার নিকট আসিয়া, আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে

লাগিল। দেখিল, চাঁদ উঠে নাই; তারাও ফুটে নাই। অন্ধকার রজনী বলিয়া, নরেন্দ্রনাথ, তরু, লতা, পাতা, ফুল ফল, কিছুই দেখিতে পাইল না। নৈশ-গগণে বিহার করিতে করিতে, 'বউ কথা কও' পাখীও ডাকিতেছে না। ইন্দুমতী থাকিতে, নরেন্দ্রনাথ এই জানালার নিকট দাঁড়াইয়া, লতা পাতায়, ফুলে ফলে নিহিত চাঁদের রজত কিরণাভা দেখিত—ইন্দুকে অঙ্গুলী সঙ্কেতে দেখাইত এবং উভয়ে হৃদয় খুলিয়া, কত কথোপকথন, কত রহস্য, কত আমোদ প্রমোদ করিত, ইয়ত্তা নাই। কিন্তু, আজ নরেন্দ্রের মনে বিন্দুমাত্রও আনন্দ জন্মিল না। বরং সেই সমস্ত অতীত কাহিনী মনে পড়াতে, যথোচিত কষ্ট হইল। নরেন্দ্রনাথ, দেখিয়া শুনিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে মনে ঠিক করিল যে ইন্দুমতীকে সকলেই ভালবাসে, তাহার দুঃখেই পৃথিবী বিষাদের ছায়ায় বিজড়িত হইয়াছে। কেহই তেমনটি নাই।

আছে কেবল—নরেন্দ্রনাথ!!



একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—⊙—

আব না।

রজনী, গভীবা—ঘন তিমিবাচ্ছন্না, সম্মুখস্থ দ্রব্যও দৃষ্টি গোচব হয না। আকাশে কিছু কিছু মেঘের আভাস পবিলক্ষিত হইতেছে। বোধ হইতেছে, যেন শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে। মেঘেব ভিতবে ভিতরে সামান্য বকম বিদ্যুৎ খেলিতেছিল।

এমন সময, ইন্দুমতী, গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইযা চলিল। গৃহেব বাহিবে পা দেওযা মাত্র, ইন্দুমতীব বিষাদেব সঙ্গে সঙ্গে যেন অল্প অল্প বাতাস বহিতে আবম্ভ কবিল এবং দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও পডিতে লাগিল। ইন্দুমতী তখন উন্মাদিনীব ন্যায় ছুটিল। ছুটিলে হইবে কি? দেখিতে দেখিতে তুফান ও বৃষ্টি হু হু ববে জগত আলোডিত কবিয়া তুলিল। ইন্দু, নিঃসহায় অবস্থায় কাঁদিতে লাগিল। বৃষ্টিব জলের সঙ্গে, ইন্দুব নয়নাশ্রু বিমিশ্রিত হইয়া গেল।

তখন পবিত্রা রমণী ইন্দুমতী নিরুপায় ভাবিয়া, পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় ইতস্তত ঘুরিতে লাগিল। :কান পথে, কোন দিকে যাইবে, তাহাব কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। কেবল উপর্য্যপবি ঘুবিয়া ঘুবিয়া, একস্থানেই বাব বাব আসিতে লাগিল। নিবিড আঁধাবে জগত সমাচ্ছন্ন বলিযা, ইন্দুমতী কোন পথই ধবিতে পারিল না। বিশেষত ইন্দুমতী পথ ঘাটও চিনে না। কাবণ, সে কখনও গৃহেব বাহিব হয নাই। কিছুকাল পবে, বৃষ্টি ও তুফান কমিযা আসিল। কেবল ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। ইন্দুমতী, সেই তডিৎ বিভায যতদূব দৃষ্টি হয, ততদূব বিদ্যুতেব সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। তড়িৎ বিকাশ ও বিলযেব সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বাহিবে আসিয়া পডিল।

গ্রামেব বাহিবে প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠ ভরিযা ঘন ঘন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাল বৃক্ষ। বৃক্ষগুলি শিবোন্নত করিয়া, দাঁডাইযা রহিবাছে। সেই সকল বৃক্ষচ্ছায়া অবলোকন কবিয়া, ইন্দুমতীর মনে ভয় জন্মিতে লাগিল। কিন্তু, ভযকে তুচ্ছ জ্ঞান করিযা, নবেন্দ্রনাথের নাম লইতে লইতে মাঠ পাব হইল। মাঠ পাব হইয়াও দুই ক্রোশ হাঁটিল। হাঁটিতে অনভ্যস্থ বলিয়া, ইন্দুমতী সত্বরই অত্যন্ত পবিশ্রান্ত হইয়া পড়িল।

তখন বৃষ্টি ও ঝড় থামিয়া গিয়াছে; বিদ্যুৎ ফুটিতেছে না। চাঁদ উঠিতেছে, যেন স্নান কবিয়া। সেই স্নাত

চন্দ্রালোকে, ইন্দুমতী অনতিদূরে একটী বাগান দেখিতে পাইল। ভাবিল, বাগানে বসিয়া, একটু বিশ্রাম করিবে। এই ভাবিয়া বাগানের অভিমুখে আসিতে লাগিল। ক্রমশ আসিতে আসিতে বাগানে আসিয়া পৌছিল। দেখিল, বাগানের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘির চারি পারে বাঁধার ঘাট। দীঘির জল স্বচ্ছ, স্ফটিক তুল্য নির্ম্মল। দীঘিটি অত্যন্ত পুরাতন। দীঘির ভিতর মাঝে মাঝে উৎপল, রক্ত ও শ্বেতবর্ণের কুমুদের গাছ জন্মিযাছে; প্রফুল্ল কমলদলে চাঁদের কিরণ নিপতিত হওযায়, নবীনা যুবতীর হাসির ন্যায় দেখা যাইতেছিল। ইন্দুমতী ইহা নিরীক্ষণ করিয়া, আর বসিল না। একটী ঘাটে নামিতে লাগিল। কেন? তা সেই জানে। একটী, দুটি, তিনটি করিয়া, প্রায় কুড়ি পচিশটি সোপান ভাঙ্গিয়া, জলের নিকট আসিল। পরে, বসিয়া বসিয়া জল নাড়িতে নাড়িতে, নিজে নিজেই কি জানি কি বলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পা দুখানার কিযদ্দংশ জলের ভিতর প্রবেশ করাইযা দিল। জলের ভিতর হইতে, সেই অনিন্দ্য সুন্দর পায়ের জ্যোতি, মেঘবিতাড়িত চাঁদের ন্যায় ফুটিযা বাহির হইল। ইন্দুমতী, নির্ভয়ে ধীরে ধীরে গলা জলে নামিলেন, এবং কি ভাবিযা জানি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ডুব দিয়া রহিল। কিন্তু, অনেকক্ষণ থাকিতে পারিল না, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে বলিয়া, অমনি উঠিয়া পড়িল। ইন্দু, তুমি কি মরিতে

চাও? জলে কি এই ভাবে মরিতে হয়? তুমি মরিতে জান না; তবে মরিতে এসেছ কেন? ঘরে ফিরিয়া যাও।

ইন্দুমতী আমাদের কথা শুনিল না। মরিবার জন্য বারংবার জলে ডুব দিতে লাগিল। ডুব দিতে দিতে হঠাৎ একটী সঙ্গীত তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। কে যেন পার হইতে গাহিল;—

পিরীতি সাগরে তুফান উঠিল রে।
তরঙ্গে তরঙ্গে বিষ উছলিল রে॥
কায নাই অবগাই, এসো মোরা বনে যাই,
শ্যাম নাম জপি, কাঁদিব ফুকরি রে॥

গান সমাপ্ত হইল। গায়িকা ডাকিল,

"ইন্দু, ও ইন্দু, কর কি? কর কি? আমি যে এসেছি।"

গান শুনিয়া, ইন্দুমতী চমকিয়া উঠিল এবং স্বর চিনিতে পারিল। জলে ডুবিয়া আর মরিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি জলের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল। পরে, বলিল,

"শৈল, তুইও আমার পথের কণ্টক হ'লি?"

ইন্দুমতী আর কিছু বলিতে পারিল না। শৈলবালা যাইয়া অমনি ইন্দুমতীর গলা জড়াইয়া ধরিল। কাঁদিয়া ইন্দুমতীর বক্ষ ভাসাইয়া দিল। রমণীর হৃদয় যেমন পরদুঃখে বিগলিত হয়, তেমন আর কাহার হয় কি?

যখন ইন্দুমতী, গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আসিতেছিল; তৎকালে শৈলবালাও কোন কারণবশত গৃহের বাহিরে আসিয়াছিল। তখন কণা কণা বৃষ্টি পড়িতেছিল। শৈলবালা, ইন্দুমতীকে উন্মাদিনীবৎ ছুটিতে দেখিয়া, অনুমান করিয়াছিল যে, বিশেষ কোন দুর্ঘটনা ব্যতিরেকে, এরূপ দুর্যোগের সময় কোথায়ও যাওয়া সম্ভবপর নহে। ইন্দুমতী দ্রুতগামী চলার দরুণ ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ পাইল না। বিশেষত শৈলবালাকে সেই মূহুর্ত্তে নিজের শয়ন ঘরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কাজেই ফিরিয়া আসিতে আসিতে, ইন্দুমতী অনেক দূর সরিয়া পড়িয়াছিল। শৈলবালা তখন ইন্দুমতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিন্তু আঁধারের নিমিত্ত তাহাকে দেখিতে পাইল না। অনুভবে চলিতে চলিতে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দীঘির পারে যাইয়া, ইন্দুমতীকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া প্রথমে কিছু করিল না; কেবল ইন্দুর আচরণ দেখিতে লাগিল। কিন্তু, যখন দেখিল, ইন্দুমতী মরিবার নিমিত্ত উপর্য্যুপরি ডুব দিতেছে, তখন শৈলবালার মনে বড় ভয় হইল। মনের আবেগে গান ধরিল। সেই গান শুনিয়াই, ইন্দুমতীর মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইল।

যাহাহউক, শৈলবালা, ইন্দুমতীর চোখের জল, স্বীয় অঞ্চলে মুছিয়া দিল। পরে, ব্যগ্রতার সহিত কহিল,

"সই, এখানে আসিলে কেন?"

ইন্দুমতী, নীবব। কিন্তু, একথায়, ইন্দুমতীর অশ্রু প্রবাহ, বেগবতী তটিনীব স্রোত-জলের ন্যায়, উছলিয়া উছলিয়া ছুটিতে লাগিল। শৈলবালা, পুনরায় কহিল,

"সই, বল কি হয়েছে?"

ইন্দুমতীব অবিশ্রান্ত অশ্রু প্রবাহই ঝরিতে লাগিল। কিন্তু, এবারও কিছু বলিল না। শৈলবালা, ইন্দুমতীব অত্যন্ত ক্রন্দন দেখিযা, উৎকণ্ঠিত হইল। বলিল,

একি! সই, একি? কেবলি কাঁদিতেছ কেন?"

ইন্দুমতী, চিত্তোদ্বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া কহিল,

"সই, প্রাণ জ্বলে বলে কাঁদি! মরিবার জায়গা, খুঁজে পাইনে বলে, এখানে মবিতে এসেছি।"

শৈলবালা, উৎকণ্ঠাব সহিত বলিল,

"ছি! সই, ছি! ও কথা বলিতে নেই।"

শৈলবালা, তখন প্রকৃত ঘটনা জানিবার নিমিত্ত, ইন্দুমতীকে ত্যক্ত বিবক্ত কবিতে আবম্ভ করিল। ইন্দুমতীও শৈলবালাব অনুবোধ উপবোধ এড়াইতে পারিল না। একে একে অকপটে নবেন্দ্রনাথ ঘটিত সমস্ত কথা বিবৃত কবিল। শুনিযা শৈলবালা সহাস্যে কহিল,

"ছি! ইহার জন্য মরিতে এসেছ? সই, মরিলে কি এ জীবনে আব তাঁহাকে দেখিতে পাবে? আত্মহত্যা, মহাপাপ! সেই পাপের ফলে, পর জন্মেও কি তাঁহাকে হারাবে?"

ইন্দুমতী, সকাতরে কহিল,

"সই, যে দুঃখে আমার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে, তার চেয়ে বরং মৃত্যুই ভাল। আমার এমন ভাগ্য নাই, অথবা এমন কোন পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য ফলও নাই; যাহাতে পুনরায় স্বামীর পদসেবা কবিতে পারিব। সে আশা, দুবাশা মাত্র।"

শৈলবালা, ইন্দুমতীকে প্রবোধ দিয়া কহিল,

"সই, দুঃখ কবিও না। অবশ্য একদিন সুদিন আসিবেই। চিরদিন আর লোকেব কুদিন থাকে না। সুদিন কুদিন সকলেবই আছে।"

ইন্দুমতী, সজল নয়নে কহিল,

"আমাকে পবিত্যাগ কবিয়াছেন বলিয়া, কোন দুঃখ নাই। তিনি সুখে ও ভাল থাকিলেই, আমাব সুখ শান্তি। আমাব দেবতার পূজা যে করিতে পাবিলাম না, সেই দুঃখই ত দুঃখ।"

শৈলবালা, ইন্দুমতীকে বুঝাইয়া কহিল,

"সই, তোমার দেবতার উপব অন্যের কোন অধিকাব নাই। তাঁহার মূর্ত্তি ত অন্তরে গাঁথা আছে? এখন হৃদয কমলে বসাইয়া, ভক্তিভাবে পূজা করিতে থাক। এজন্মে না হয়, পবজন্মে পাবেই। তার জন্য ভাবনা কি?"

ইন্দুমতী, নীরব।

ইন্দুমতী, আর্দ্র বস্ত্রের নিমিত্ত শীতে কাঁপিতেছিল।

শৈলবালা, তাহার কম্পিত কলেবর বিলোকন করিয়া, তাড়াতাড়ি কুক্ষি নিহিত একখানা কাপড় খুলিয়া দিল। বোধ হয়, আসিবার কালে, শৈলবালা, এই কাপড আনিতেই গিযাছিল। যাহাহউক, ইন্দুমতী, কাপড় পড়িল। শৈলবালা, ভিজা কাপড়ই পরিয়া রহিল। কহিল,

"সই, এখন কি করিবে? এসো দুজনে বাড়ী ফিরে যাই।"

ইন্দুমতী, বিষাদে স্ফুরিতাধর হইয়া, কাঁদ কাঁদ ভাবে কহিল,

"সই, আর ওকথা বলিও না। সে পথে কাটা পড়িয়াছে।"

শৈলবালা। কেন, সই?

ইন্দুমতী, কোন উত্তর করিল না। মনে মনে ভাবিল, ফিরিয়া যাইতে ত ইচ্ছাই হয়; কিন্তু ফিরিব কি প্রকারে? ফিরিবার কি মুখ আছে? যখন স্বামী দেখিয়া দুঃখিত হন, তখন তাঁহার প্রাণে বেদনা দিতে যাব না। স্ত্রীর উচিত—স্বামীর সুখের পথ পরিষ্কার রাখা। আমি কেন সে পথের কণ্টক হইতে যাইব? পরে প্রকাশ্যে কহিল,

"সই, আমি যাব না।"

শৈলবালা ভাবিয়াছিল যে, ইন্দুমতীর মনোকষ্ট কিছু উপশম হইলে, বলিয়া কহিয়া বাড়ীতে ফিরাইয়া নিয়া

যাইতে পারিবে। কিন্তু, ইন্দুমতীর অনভিপ্রায় দেখিয়াও আবার বলিল,

"সই, চল গৃহে যাই।"

ইন্দুমতী, সবিষাদে কহিল,

"আর না।"



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—◠—

পত্র।

তারাকান্ত, নরেন্দ্রনাথের প্রতিবাসী ও বন্ধু। বলিতে গেলে, উভয়ে একআত্মা একপ্রাণ। যেন হরিহরাত্মা। প্রভাতে উঠিয়া, তারাকান্তের ভৃত্য, তারাকান্তকে একখানা চিঠি দিল। তারাকান্ত, নরেন্দ্রনাথের হাতের লেখা চিনিত। লেখা দেখিয়া, নরেন্দ্রের পত্র চিনিতে পারিল। এত সকালে, নরেন্দ্রের পত্র পাইয়া, অত্যন্ত উৎদ্বিগ্ন হইল, এবং তাড়াতাড়ি পত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া, পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িল,—

"তারাকান্ত,

বাসনা ছিল, তোমাকে গুটি দুই মনের কথা বলিয়া যাইব। সে অভিলাষ, ইচ্ছা করিলে, পরিপূর্ণ করিতে

পারিতাম। কিন্তু, তাহা করিলাম না; করিলে তুমি আসিতে দিতে কি? তোমার চোখে যমুনা বহিলে ও নাসিকায় তুফান ছুটিলে আসিতে পারিতাম কি? কখনও না। তুমি হয়ত বলিবে, পাষাণে কর্দ্দম থাকে কি? সে কথাও যথার্থ। আমি এখন পাষাণ হইতেও কঠিনতম। সামান্য চোখের জলে, আমার বজ্রসম কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হয় না। যখন ইন্দুমতীকে পায়ে ঠেলিতে, আমার পাষাণ পরাণ বিগলিত হইল না, তখন আমি কি মানুষ? এ সংসারে মানুষ চিনা দুষ্কর। কে যে কি ভাবে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, তা কে বলিতে পারে? কে বলে মানুষ দেবতা? মানুষ,—রাক্ষস। এ রাক্ষসে না করিতে পারে, এমন কার্য্য ইহ জগতে কিছু নাই। নৈলে পাপিয়সী গৌরমণি, (ছি! নাম করিতেও লজ্জা করে) আমাকে কি জানি কি কুহকে ভুলাইয়া, আমার সোণার সুখের জীবনটি ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিত কি? প্রায় মাসেক হইল, তুমি আমাকে প্রতুলের শত্রুতার যথেষ্ট প্রমাণ দেখাইয়াছ—দেখাইতেছ; এবং এই কার্য্য করিয়াই যে, পাপাত্মা প্রতুল ও গৌরমণি, দেশত্যাগী হইয়াছে, তাহারও প্রচুর প্রমাণ দিতে ক্রটী কর নাই। এখন বুঝিয়াছি, আমার দোষেই, ইন্দুমতী গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে।

ভাই, এখন সেই ভীষণ মুহূর্ত্তের কথা মনে পড়িলে,

সমস্ত শরীরে যেন তীক্ষ্ণবিষপ্রবাহ উৎপ্লুতভাবে ছুটিতে থাকে। বস্তুত যাহার প্রেমালিঙ্গনে, যাহার অমিয়া মাখা প্রেম পীযূষ পরিপূর্ণ সতৃষ্ণ দরশনে আমার আঁধার হৃদয়ে শশধরের কোমলসুস্নিগ্ধদীপ্তিতে স্ফুটোন্মুখ কুসুম-কোরকের ন্যায় ধীরে ধীরে অনন্ত আনন্দ জন্মিত, হায়! নিরর্থক সেই ইন্দুমতীকে পায়ে ঠেলিয়া, এখন শূন্য প্রাণের অনন্ত যাতনা উপভোগ করিতেছি। এখন আমার হৃদয়ে সেই সুখ নাই, সেই স্ফূর্ত্তি নাই, পূর্ব্বের কিছুই নাই। থাকিবার মধ্যে কেবল আছে—অনুতাপানল। তারাকান্ত, সেই অনল যে কত প্রখরভাবে জ্বলিতেছে, তাহা আর তোমাকে কি বলিব? বুক চিরিয়া দেখাইতে পারিলে সেই অনল-শিখা দেখাইতাম।

ইহ জগতে, যদি কিছু সুখ থাকে, তবে, সে স্ত্রীর পবিত্র ভালবাসা। ইহার নিকট স্বর্গ সুখও তুচ্ছ। নিদারুণ বিষাদে, যখন হৃদয় জর্জ্জরিত হয়, যখন গভীর শোকে, শরীর বিবশ হয়, তখন যদি স্ত্রীর ভালবাসা পরিপূরিত লোচনের পানে, একবার নিরীক্ষণ করা যায়, তবে, মুহূর্ত্তের ভিতরে, সেই ভীষণশোকসন্তাপ বিদূরিত হইয়া, অনন্ত আনন্দ জন্মিয়া থাকে। এ জগতে, সেই সুখের তুলনা হয় না। বিবাহ করিলে, এ সব জানিতে পারিবে। বিধাতার সৃষ্টিতে কত সুখের, কত নয়ন প্রীতিকর সামগ্রী পড়িয়া আছে; অভাব নাই। কিন্তু, এখন আমার সেই

সকলে কিছুমাত্র সুখ হইতেছে না। প্রাণ উদাস্ উদাস্ করিতেছে, কিছুতেই ভাল জ্ঞান হইতেছে না। বুঝি, জগতে স্ত্রীই শান্তিদায়িনী। কিন্তু, বুঝিয়াও কি করিলাম? বিনা দোষে, বিনা অপরাধে, সেই অতীব ভালবাসার জিনিষ, যাহাকে মাটিতে রাখিতে কষ্ট হইত, যখন সেই অতি আদরের ইন্দুমতীকেই, জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়াছি, তখন আর সুখের আশা কি? ইন্দুমতী, আমার সুখ ও শান্তি নিয়াছে, এখন আমি সেই সুখের অন্বেষণে চলিলাম। যদি খুঁজিয়া পাই, তবেই ফিরিব, নতুবা এই পত্রই শেষ দেখা বলিয়া জানিও।

আর একটি কথা। শূন্য পিঞ্জিরা রাখিয়া ফল কি? পাখী থাকিলেই পিঞ্জিরার আদর। পাখীর বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে পিঞ্জিরার আবশ্যকতা ও আদর ঘুচিয়া যায়। আমারও সেই অবস্থা হইয়াছে। ইন্দুমতীর জন্যই, এতদিন এ দেহ ধারণ করিয়াছিলাম। সেই পাগ্লিই যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন আর এ শূন্যহৃদয়পিঞ্জিরার প্রয়োজন কি? কাহার জন্য আর এ দেহের আদর যত্ন করিব? ইন্দুমতী গৃহে থাকিলে, মরিতে অভিলাষ হইত না। তখন ভাবিতাম, মরিলে ত ইন্দুর ইন্দুবদন দেখিতে পাইব না; ইন্দুমতীরও অসীম দুঃখ হইবে। কিন্তু, এখন স্থির করিয়াছি, জলে, রৌদ্রে ও অনাহারে, যে প্রকারে পারি, এ দেহ বিসর্জ্জন দিব। শূন্য পরাণের যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।

শেষ কথা। পৃথিবীব কোন বস্তুই, আমাব নিকট ভাল বোধ হয না। সকলি বোধ হয় যেন মলিন,—কেমন কেমন। তুমি হয়ত নব কিশলয় ও ফুলে পরিশোভিত মাধবীলতা দেখিযা বিমুগ্ধ হও; অথবা বসন্ত কালেব শেষ রজনীব বমণীয় ঘুমন্ত জোছনা দেখিযা এবং শুইয়া শুইয়া "বউ কথা কও" পাখীর সুললিত রব শুনিয়া, নিতান্ত প্রীতি উপভোগ কব। আব হয়ত আধ ঘুমন্ত ঘোরে পঞ্চম বাগিণীতে, কাহারও কোকিল কণ্ঠেব গান শ্রবণ কবিযা বিমোহিত হইযা থাক। কিন্তু, ভাই, এখন আমি ইহাব কিছুতেই কি সুখ, কি প্রীতি, কি আনন্দ, কিছুই উপলব্ধি কবিতে পাবি না। পূর্ব্বে পাবিতাম। এখন এ সকল যেন বিষাক্ত বলিযা প্রতীতি হয। ইচ্ছা হয, যেখানে এসব দেখি বা শুনি, সেখান হইতে চলিয়া যাই। আমি ঘোব মুর্খ। কোথায যাইব? যাইবাব কি স্থান আছে?

আব এক দুঃখ, জগত ছাড়া সবিযা পবিমাণ স্থান নাই। কাজেই, যেখানে যাইব, সেইখানেই ইন্দুমতীব আদবেব অনেক সামগ্রী দেখিতে পাইব। ইন্দুব ভাল-বাসাব জিনিষ দেখিলে হৃদয ফাটিযা যাইতে থাকে। ইন্দুমতী আমাব যূঁই, চাঁপা, বেলি, গোলাপ, প্রভৃতি ফুল ও পবিষ্কাব নিখুঁত চাঁদেব কিরণ দেখিতে বড ভালবাসে, বল দেখি ভাই, আমি এ সকলেব হাত হইতে, বিমুক্ত হই কি প্রকাবে? কুসুমের অভাব ঘটিতে পাবে, কিন্তু, আকাশে

চাঁদ ফুটিলে, কোথায় পলাইব? এবং না দেখিয়াই বা কি প্রকারে থাকিব? তাই বলিতেছিলাম যে, যদি জগত ছাড়া দাঁড়াবার স্থানটি থাকিত, তবে, না হয় এ সকল পরিত্যাগ করিয়া, সেইখানে যাবজ্জীবন থাকিতাম। আশা করি, তুমি অতি সত্বর, ইহার একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়া পাঠাইবে। আমার ভাল মন্দ বিচার শক্তি লোপ পাইয়াছে। তুমি ভিন্ন, এখন আর আমার বলিতে কেহ নাই! এ হতভাগাকে ভুলিও না। তুমি আমার চোখ ফুটাইয়াছ, সেই ঋণ এজনমে শোধ করিতে পারিব না।

হতভাগা,

নরেন্দ্রনাথ।”

এই পত্রখানা রজনীতে, নরেন্দ্রনাথ, তারাকান্তের ভৃত্যের নিকট রাখিয়া গিয়াছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

পত্রোত্তব।

অল্প বেলা আছে। এমন সময়, বাহিব বাডীব টুলেব উপবে, তাবাকান্ত ভগ্নমনে, ধুতীব কিয়দংশ গাত্রে দিয়া বসিয়া আছে। সম্মুখে কেহই নাই। সকলেই কাজ কর্ম্মে নিযুক্ত বহিযাছে। নবেন্দ্রেব বিচ্ছেদ জনিত কষ্টে, তাবাকান্তেব চোখে অশ্রু ঝবিতেছে। অশ্রু, তুমি নির্জ্জনে প্রবাহিত হও কেন? নীববে প্রাণেব বেদনা ফুটে কি?

হঠাৎ পিয়ন আসিয়া, একখানা পত্র দিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাবাকান্ত পত্র খুলিয়া, পডিতে আরম্ভ করিল। পডিল, –

কাশীধাম, যোগাশ্রম।

৪ আষাঢ, ১২৬৬ সাল।

"তাবাকান্ত,

এইমাত্র সাতদিনেব গুরুতব পবিশ্রমেব পব, কাশীতে

এসেছি। ভাবিয়াছিলাম, এখানে আসিয়াই, বিশ্বেশ্বরকে দেখিতে যাইব; কিন্তু যাওয়া হইল না। আমি অসম্পূর্ণ; আমার, অর্দ্ধাঙ্গ নাই? একচোখে দেখিয়া লাভ কি? আর একচোখ পাইলে, ভবিষ্যতে দেখিবার অভিলাষ রহিল। বিশ্বেশ্বর কি সেই আশা পূর্ণ করিবেন? এখানে এক পাণ্ডাঠাকুর বড়ই দয়ালু। তিনি অনুগ্রহ করিয়া কালি কাগজ না দিলে, এই পত্রও লিখিতে পারিতাম না। যাহাহউক, এই সাতদিনে যে সমস্ত দেশ, গ্রাম, নগর, বন ও উপবন দিয়া আসিয়াছি, তাহার কোথায়ও ইন্দুমতীর দেখা পাইলাম না। বোধ হয়, তাহারা আমার প্রতি অভিমান করিয়া, কোথায়ও লুকাইয়া রহিয়াছে। না, আমি ভুল লিখিলাম। ইন্দু, আমার উপর অভিমান করে নাই। কারণ, কখনও ইন্দুকে অভিমান করিতে দেখি নাই। আমার চোখ নাই, বোধ হয়, সেই জন্যই তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। আমার চোখে কি রোগ হইল, বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ জানিলে লিখিও।

আসিবার সময় একখানা পত্র লিখিয়া আসিয়াছি। বোধ হয়, এতদিন তাহা পাইয়া থাকিবে। সেই পত্রেই আমার মানসিক অবস্থা লিখিয়াছি। এখনও অনেক লিখিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু বেশী লিখিয়া আর তোমাকে কষ্ট দিব না। আমার কষ্ট জানিয়া, তুমি কেন বিরলে

কাঁদিবে? তোমার মঙ্গল প্রার্থী। আমি এক প্রকার আছি।

হতভাগ্য,

নরেন্দ্র।"

পুঃ,—আমার পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা করিও। তুমিও ত আমার এক ভাই। সংসারে একজন পাগল হয় বলিয়া, সকলেই আর হয় না? ইহ জগতে, পিতা, পুত্রের পরম দেবতা। একথা ভুলিও না।"

তারাকান্ত, পত্রখানা দুই তিনবার পড়িল। পড়িয়া, একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। পরে, তখনি পত্রোত্তর লিখিতে বসিল। লিখিল,—

হাসিকান্না

১৫ আষাঢ়।

"নরেন্,

এইমাত্র তোমার পত্র পাইলাম। পূর্ব্বের পত্রও পাইয়াছি। তোমার অভাবে, আমরা সকলেই ম্রিয়মাণ। তুমি যে আমাদিগকে কি করিয়া গিয়াছ, তাহা আর পত্রে লিখিয়া কি জানাইব? বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার হৃদয়ে, এখন অনন্ত যাতনার উদ্রেক হইয়াছে। ইন্দুমতীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাস; তাঁহার অভাবে না ঘটিতে পারে, এমন কিছু নাই। এটিও বেশ বুঝিতে পারি। তোমার যখন যথেষ্ট অনুতাপ হইয়াছে, তখন আর ইন্দুমতীকে

পাইতে বেশী গৌণ হইবে না। অনুতাপের পরই শান্তি—অনিবার্য্য। প্রার্থনা করি, বিশ্বেশ্বর তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। আর এককথা, বিশ্বেশ্বরকে না দেখিয়া ভাল কার্য্য কর নাই। যে বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া, বিশ্বেশ্বরকে দেখ নাই, সেটি তোমার ভ্রম বিশ্বাস। তুমি হয়ত দোপাটি ফুল দেখিয়া থাকিবে; জান ত তাহার একটী বৃন্ত চ্যুত হইলেও অন্য বৃন্তে ফুলটি আকৃষ্ট থাকে। ইন্দুমতী আর তোমার সম্পর্ক কেবল এ জগতের নহে—পরজন্মেরও। কেহই কাহাকে ছাড়িতে পারিবে না। এটি নিশ্চয় জানিও।

তাই বলি, ভাই, কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া, বিশ্বেশ্বরকে দেখিতে যাইও, বাসনা পূরিবে। এখনও সম্পূর্ণই আছ। জানি, ভালবাসা পরিপূরিত চক্ষু চিরকাল রোগগ্রস্ত। জগতে যত কেন সুন্দর প্রীতিপদ বস্তু থাকুক না, ভালবাসার মানুষ ব্যতীত, সেই চক্ষুতে অন্য কিছুই সুরম্য দেখিতে পায় না। অতএব, ইন্দুমতী ভিন্ন অন্য কেহ, তোমার চক্ষু-রোগের প্রতিকার করিতে পারিবে না। তোমার নিমিত্ত, তোমার পিতা মাতা প্রায় জীবন্মৃত! তাঁহাদের প্রাণে কষ্ট দেওয়া উচিত কি?

যাহাহউক, কিছু অর্থ পাঠাইব কি? সঙ্গে পাথেয় থাকা ভাল। জান ত, পথে কত আপদ বিপদ আছে। শরীর সুস্থ রাখিতে বিশেষ যত্ন করিও। অসুস্থ হইয়া

পড়িলে, অভিলষিত কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিবে। রায়মহাশয়, তোমাকে খুঁজিতে দেশ-বিদেশে লোক পাঠাইয়াছেন। আমরা তোমার বিরহে কাতর। সর্ব্বদা শারীরিক কুশল লিখিতে ভুলিও না।

তোমারি

তারাকান্ত।”

তারাকান্ত, পত্র লিখিয়াই ডাকে পাঠাইল, এবং রায়বাড়ীতে পত্রের বিষয় বলিয়া একবারে কাশীতে চলিয়া গেল। পত্রের ভিতরে এ সংবাদ লিখিল না। কারণ, এ সংবাদ জানিতে পারিলে, হয়ত নরেন্দ্র অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে।

যথাসময়ে পত্রোত্তর আসিল। পত্র পাইয়া, নরেন্দ্র কিছু ভাবনায় পড়িল। পরে, উত্তর লিখিল যে, টাকাকড়ি কিছুই পাঠাইও না। অর্থই অনর্থের মূল। পিতা মাতার আমি কুসন্তান, তাঁহাদের মনে সুখ দিতে পারিলাম না। তুমিই তাঁহাদের যত্ন করিও। আমার নিকট আর পত্র লিখিও না। শীঘ্রই আমি স্থানান্তরে যাইব।

এই পত্রও তারাকান্তের বাড়ীতে আসিল। কিন্তু, সে বাড়ীতে নাই বলিয়া, পত্রখানা রায়বাড়ীতে দেওয়া হইল। পত্র পাইয়া, রায়মহাশয়, নূতন চিন্তায় বিজড়িত হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মত্ততা।

ইন্দুমতী চলিয়া গিয়াছে—আছে শোক—আছে অবসাদ। কায়া চলিয়া গিয়াছে—আছে মাত্র ছায়া, কায়ার অবসানের সহিত জীবনের সুখ শান্তি, সরস বসন্ত সকলি ঝরিয়া যায়, ছায়া—চিন্তার কোলে আশ্রয় পাইয়া বাড়িতেছে—হাহাকার করিতেছে। অগ্রে যাহা নরেন্দ্রনাথ দেখে নাই, ভাবে নাই, আজ তাহা দেখিল—ভাবিল। এখন ইন্দুমতীতে নিত্য কত নূতন মাধুরী, কত সুকুমার ভাবের ফোয়ারা দেখিতে লাগিল। এ ইন্দু যেন সেই ইন্দু নহে—এ যেন স্বর্গের বিভব! কেন সন্দেহের বশীভূত হইলাম? কেন আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিলাম? আমার কি না ছিল? প্রেম, প্রীতি, করুণা, হাসি খুসি, সুখ শান্তি কি না ছিল? আমার ইন্দু, আমার

পুণ্যের পুরী; স্নেহের শতদল, সতীত্বের শ্বেতস্তম্ভ। কেন কলঙ্ক ঢালিয়া দিলাম? স্তম্ভ বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল,—পদ্ম বুঝি ঝরিয়া গেল? আহা! স্তম্ভের গাত্রে কেমন প্রেমের লতাটি জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিতেছিল—ফুটিতেছিল; কেমন সেই ফুটন্ত ফুল। কেমন সে ফুলের হাসি—কেমন গন্ধ—কেমন কান্তি!! আমি কীট—নরকের কীট; ফুলের বুকে বিষ-দংশন করিলাম।

নরেন্দ্রনাথের যেইকথা, সেইকার্য্য। তারাকান্তকে পত্র লিখিয়াই, কাশী ছাড়িল। কাশী ছাড়িয়া, স্থানে স্থানে ইন্দুমতীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। অহর্নিশি ইন্দুমতীর চিন্তা ভাবনায় নরেন্দ্রনাথের শরীর অত্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার শক্তি বিলোপ পাইল। নরেন্দ্রনাথকে, কেহ খাইতে দিলে খায়, নতুবা অনাহারে দিন যাপন করিয়া থাকে। অনাহারে অনিদ্রায়, দেহের এত পরিবর্ত্তন ঘটিল যে, নরেন্দ্রকে আর নরেন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। প্রতিনিয়ত কি চিন্তা, কি ভাবনা, ভাবিতে থাকে, নরেন্দ্রই বলিতে পারে। ঘাটে, মাঠে, পথে, যেখানে সেখানে, নরেন্দ্রনাথ বসিয়া বসিয়া, কি জানি কি বিড়্ বিড়্ করিয়া ভাবিতে থাকে। সম্মুখে কোন লোকজন দেখিলেই হাসিয়া উঠিয়া যায়। এ ভাবে, অনেক দিন কাটিয়া গেল। ইন্দুমতীকে কোথায়ও পাইল না।

এখন ত নরেন্দ্রনাথ, ঘোর উন্মাদ! কোন শ্মশানে, অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থায় শায়িত। শ্মশানে রাশি রাশি অঙ্গার বিক্ষিপ্ত; অর্দ্ধভঙ্গ, সম্পূর্ণ ভঙ্গ, মৃৎকলস কত গড়াগড়ি যাইতেছে, কোন কোনটার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাতে, হো, হো শব্দ হইতেছে; শ্মশানময়, অস্থি-কপাল-কঙ্কাল পরিপূরিত। চুল্লী, পরিষ্কার,—কেবল মাত্র কড়িগুলি বিকট দন্ত বিস্ফারিত করিয়া, ধন জন যৌবন ক্ষণস্থায়ী,—কাহার সহিত কাহার সম্পর্ক নাই,—কিছুতেই গর্ব্ব করিতে নাই,—এ ত্রিতাপ পরিপূরিত সংসারে সকলি যে অসার,—তাহাই প্রকাশ করিতেছে। আর স্থানে স্থানে তুলসী গাছগুলি, অতীতের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তুলসী, তুমি শ্মশানবক্ষে কেন? এ জগতে আর কি তোমার থাকিবার স্থান নাই? তোমাকে এখানে দেখিলে, আমাদের মনে কত ক্লেশের, কত যাতনার, কত ব্যথার কথাই যে মনে পড়ে, তাহা আর কত বলিব? তোমাকে শ্মশানে দেখিলেই পাঁজর ভাঙ্গিয়া, হু হু করিয়া, শোকসাগর উদ্বেলিত হয়; অতীত মানবের সুখ-স্মৃতির প্ররোচনায় হৃদয়ে কঠোর আঘাত লাগে। মা, তুমি যে পরদুঃখে প্রত্যহ প্রভাতে ব্যাকুল প্রাণে কাঁদ, ঐ যে টস্ টস্ করিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু ঝরিতেছে, তাহাও ভুলিয়া যাই। ইচ্ছা হয়, শ্মশানক্ষেত্র হইতে তোমাকে তুলিয়া ফেলি!

যাহাহউক, নবেন্দ্রনাথ শয়ন অবস্থাতেই কখনও হাসিতেছে, কখনও কাঁদিতেছে। সহসা হাসিয়া উঠিল, উঠিয়াই নিকটস্থ একটী মৃত কুকুরের শব লইয়া, উৰ্দ্ধে নিক্ষেপ করিল। শূন্যে নিক্ষিপ্ত কুকুরটী মাটিতে পড়িবা মাত্র, পুনরায় যাইয়া জড়াইয়া ধরিল। নবেন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর কুকুরের শোণিতে সুরঞ্জিত হইল। মৃত কুকুরটি ছাড়িল। ছাড়িয়া চিতাস্থিত একটী মৃণ্ময় কলসকে চিতায় নিপতিত ছিন্ন নেকড়া দিয়া, আবৃত করিতে লাগিল এবং আবৃত করিয়া, কলসটাকে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। মৃণ্ময় কলসটি ভাঙ্গিয়া, হি, হি, করিয়া হাসিতে হাসিতে নৃত্য করিতে লাগিল। দুই বাহু তুলিয়া না না ভঙ্গি করিতে লাগিল। পরে, শ্মশানে একটি ক্ষুদ্র বালিশ পড়িয়াছিল, সেই উপাধানে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল; আবার উঠিয়া নাচিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে খুব উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল :—

"খুব ধান চাল—ই—নী—ফে—ণী—বে—ণী—"

শ্মশানের অনতিদূরে, একদল বালক খেলা করিতেছিল। নবেন্দ্রনাথের উচ্চ ধ্বনি শুনিয়া, বালকগণ, খেলা ফেলিয়া, নবেন্দ্রনাথের অভিমুখে ছুটিল। নবেন্দ্রের নিকটে আসিয়া, কেহ ঢিল ছুড়িতে লাগিল, কেহ থুঁ থুঁ দিতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ ধূলা ও তৃণাদি উড়াইয়া, নবেন্দ্রনাথের গাত্রে দিতে লাগিল। নবেন্দ্র, এসব উৎপাত

সহ্য করিতে না পারিয়া, ভয় প্রদশনার্থ এক একবার বালকদিগের অভিমুখে দৌড়িয়া যাইতে লাগিল। ছেলেরা কিন্তু তাতেও ভয় পাইল না। ববং উপদ্রবেব বৃদ্ধি হইল। তখন নরেন্দ্রনাথ, নিরুপায় ভাবিয়া, অন্যত্র চলিয়া যাইতেছিল; অকস্মাৎ একটী বালকের সজোরে নিক্ষিপ্ত ঢিল আসিয়া, নবেন্দ্রেব কপালে লাগিল। নরেন্দ্রর ললাটে ঢিল লাগিবা মাত্র, তীবেব ন্যায় বক্ত প্রবাহ, ঝলকে ঝলকে ছুটিতে লাগিল। নবেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। বালকেবা ভীত হইয়া প্রস্থান করিল। তখন প্রায সন্ধ্যা হয় হয়। বাত্রি প্রায় চাবি দণ্ডের সময়, নবেন্দ্রনাথের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। দেখিল, বালকেরা কেহই নাই। তখন নিরুপদ্রব ভাবিয়া, ধীবে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। সম্মুখে একটী বটবৃক্ষ ছিল, নবেন্দ্রনাথ, তাহাব তল দেশে যাইয়া বসিল এবং বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

ভাবিল, হে ভগবন! সকলে তোমাকে দয়াময় পতিত পাবন বলিয়া থাকে। কিন্তু, আমি ত তোমার দয়ার কিছু মাত্রও লক্ষণ দেখিতেছি না। তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুর নির্দ্দয়। তোমাকে যে দয়াময় বলে, বোধ হয়, সে আরও নিষ্ঠুর!! পাষাণে কর্দ্দম নাস্তি। তবে আর তোমায় ডাকিব কেন? নির্দ্দয়কে ডাকিয়া লাভ কি? বরং না ডাকিলে সুখ শান্তি আছে। কেবল তোমাব সত্তা ভাবিলেই, নানা প্রকার

ভয়ের উদ্রেক হয়। যদি তোমার সত্ত্বাই না ভাবি, তবে আর ভয কি? তাই বলি, তোমাকে ডাকিতে গেলেই, যত কষ্ট, যত লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভুগিতে হয়। অনন্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও যদি তোমাকে এ জন্মে পাওয়া যাইত, তবু না হয ডাকিতাম। কিন্তু, যাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে মুখে চোখে জল বাহির হইলেও, এমন কি সংসার ছাড়িযা, নিভৃতবনে ফল মূল ভক্ষণ করিয়া, জন্ম জন্মান্তর ভবিযা ডাকিলেও যাহার সহজে দযা হয় না, বল দেখি, এমন পাষাণকে কে ডাকে? তবে যে দু একবার ডাকি সে কেবল যম বেটার ভযে, ঐ বেটা নাকি বৈষ্ণবচূডামণি। যে এত বড় ভযঙ্কর, সে কি প্রকার বৈষ্ণব? বৈষ্ণবের সদাই সখ্য ভাব, কিন্তু এ বেটার কেবলই কঠোর নিষ্ঠুরাচরণ। এ বেটার পারিষদগুলি আরও নিষ্ঠুর। নাথ, আমি তোমায় বেশ চিনিয়াছি, তুমি কাকের উপর কামানের চোট ছাড়িতে খুব মজবুত! তাইত, ক্ষুদ্রকে যে সংহার না করিল, তাহার মহত্ত্ব কোথায়? (হাসি।)

দীনবন্ধু, আমার পাপ, এখনও খণ্ডন হয় নাই কি? পিপীলিকা, ক্ষুদ্র প্রাণী, তার দংশনে, বলবান মনুষ্যও শিহরিয়া উঠে। আর আমি ত তোমার নিকট ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আমার আর্ত্তনাদ কি তোমার শ্রুতি গোচর হয না? না, কাণের মাথা খেযে বসেছ? তা হইলেও এক আপদ যাইত। আর কেহ তোমায় ডাকিত না! তাই

বলিতেছিলাম যে, তোমার রাজ্যে সুবিচার সুশৃঙ্খলা নাই। যাঁহার এত বড় সাম্রাজ্য, তাহার বুদ্ধির দৌড়ও খুব বেশী হওয়া উচিত। তোমার তত বড় বুদ্ধি শুদ্ধি নাই; তুমি রাজার অনুপযুক্ত! (হি হি, হাসি।)

আমাকে রাজা কর! দেখিবে, রাজ্যের কি সুবিচার—সুশৃঙ্খলা। আমাকে রাজা করিলে, কেহ হাহাকার করিবে না, কেহ তোমাকে নিষ্ঠুরও বলিবে না। বরং তোমার এই ভীষণ অপযশের ভিতর প্রখর যশো-বিভা, মধ্যাহ্ন তপনের জ্যোতির ন্যায় চারিদিকে বিস্ফারিত হইবে। বলি, শান্তির রাজ্য করিতে পারিলে, কে অশান্তির রাজ্য করিতে যায়? রাজ্য বিপ্লবে লাভ কি? আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি, তোমাকে কোন কুপরামর্শ দিয়া, তোমার মাথা বিলোড়িত করিব না। বরং এখন যাঁহারা তোমার মন্ত্রী পারিষদ আছেন, তাঁহারাই তোমাকে সময় সময় অস্থির করিয়া তুলিয়া থাকেন। মনে করিও না, আমাকে রাজা করিলে, তোমার রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে বা বনবাসী হইয়া ফল মুল খাইতে হইবে। (হাসি) তাহার কিছুই করিতে হইবে না। আমি রাজা হইলে, তুমি রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইবে। তোমার পদ মর্য্যদা ও গৌরব আরও বাড়িবে। আমি মাত্র নামে রাজা হইয়া, শাসনাদি কার্য্য করিব। এটি কি মন্দ কথা? (হাসি ও মুখ ভঙ্গি)।

আমি রাজা হইলে, প্রথমেই যম বেটাকে বরখাস্ত করিতাম। এ বেটাকে বেশী মাহিনা দিবার দরকার কি? বিশেষত এ বেটা বড় গোঁয়ার! বেটার আকৃতি প্রকৃতি, আচার ব্যবহার ও বাহুল্য ব্যয় দেখিয়া, সকলেই অসন্তুষ্ট ও শঙ্কিত। এ বেটা কখন কাহার মাথায় বজ্রাঘাত করে, নিশ্চয় নাই। এ বেটাকে বরতরফ করিয়া, আমাদের বাড়ীর পাঁড়েঠাকুরকে নিযুক্ত করিতাম। সে আপ্-খোরকী ৮৲ টাকা মাহিনা পাইয়া থাকে। যখন অত বড় পদবীতে বসিবে, তখন না হয় ২৫৲ টাকা মাহিনা করিয়া দিব। পাঁড়েঠাকুরের বেশ সুন্দর চেহারা; স্বভাবটিও বড় বিনম্র। বিশেষত সে পরশ্রীতে কাতর নহে। শরীরে দয়ামায়াও বেশ আছে। যমবেটার ন্যায় ভীষণ রাগী নহে। যমবেটা যেমন যাকে ধরে, তাকে আর ছাড়ে না, সে তেমন নহে। কেহ দোষ করিয়া, পাঁড়েঠাকুরের নিকট কাঁদিয়া পড়িলে, যথাসাধ্য উপকার করিতে ত্রুটি করে না; সে গরীব ভিক্ষুক, কাঙ্গালদিগকে মুঠে মুঠে চাল বিতরণ করিয়া থাকে। অত বড় দয়ার শরীর না হইলে কি, রাজার যশ বাহির হয়?

তারপর, চিত্রগুপ্ত বেটাকে বরতরফ করিতাম্। এ বেটাও মিছা মিছি খাতা লিখিয়া, লম্বা চৌড়া মাহিনা খাইয়া থাকে। আর দিস্তায় দিস্তায় কাগজের শ্রাদ্ধ

করে। বেটা যদি এক স্থানে কাগজগুলি মজুত করিযা রাখিয়া দেয, তবে, বেটার বুড়া মাকে পুড়াইবার বেশ সুযোগ হয়। (হাসি।) আজ কাল যে প্রকার বৃষ্টি বাদলের দিন পড়িয়াছে, তাতে, ভিজা কাষ্ঠে দাহকার্য্য সুন্দররূপ হয় না! যে কার্য্যে কাগজের নিষ্প্রয়োজন, সেই কার্য্যের জন্য, এত পয়সা কেন? কে কি কার্য্য করিল, কে কাহাকে খুন করিল, কে জন্মিল, এ সব জমাখরচের প্রয়োজন কি? মরুক, বাচুক তাতে তোমার আসে যায কি? এত পয়সা খরচ নয, কেবল আপনার উদরপূর্ত্তি করা মাত্র। নতুবা চিত্রগুপ্তের স্ত্রীর গায এত গহনা, এত জেকেট, এত বডি কেন? যত জুযাচোরের হাতে কারবার। তা নৈলে এত পয়সার অনাটন কেন? এবং কেনই বা প্রজারা খাইতে না পাইযা, হাহাকার করিতেছে? তাই বলি, এ ছুবেটাকে বরতরফ করা নিতান্ত উচিত। তুমি বৈকুণ্ঠে থাক, তুমি ত আর এ বেটাদের কার্য্য কর্ম্ম স্বচক্ষে দেখ না। বেটারা যে কাগজ পত্র পাঠায, তাহা দেখিযাই, তুমি তাহাদিগকে ভালবাস। বলি, বেটারা কি দেশের যথার্থ কথা জানায? রাজা যদি ভাল হয, তবে প্রজার সুখের সীমা থাকে না। এই ছুবেটার যে প্রকার বুদ্ধি শুদ্ধি, ইহা অপেক্ষা শতগুণ বুদ্ধিশালী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি অল্প মাহিনায় দিতে পারি। কিন্তু, তুমি আমাদের প্রতি সেই করুণা করিবে না।

তোমার ইচ্ছা থাকিলেও পারিষদবর্গের মন্ত্রণায় কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। প্রভু হে, একবার আমাদের প্রতি করুণা চক্ষে চাও। আমরা অকৃতজ্ঞ নই। (হি, হি, হাসি।)

নরেন্দ্রনাথ, ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:০

আশ্রয়ে।

উষা বড় সোহাগী মেয়ে। শুকতারা ওকে খুব ভালবাসে। সারা রাত জননীর রূপকথা শুনিয়া শুনিয়া, এখন একটু ঘুমিয়েছে। উষাকে জাগান বড় কষ্টকর ব্যাপার। এই সবে চোখের পাতা দুটি পড়িয়াছে।

শুকতারার স্বামী বড় শান্ত শুদ্ধ। তার ঘর কন্নাটিও বড় সুখের। নিজের কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে। কিন্তু, সে করদ রাজা! তাঁহার সৈন্য সামন্ত গুলিও বড় শিষ্টাচারী—বড় প্রভু ভক্ত। এখন প্রভু বিষয় কার্য্যে চলিয়াছেন; সেনাগুলিও তাঁর পিছু পিছু ছুটিয়াছে।

শশাঙ্করাজ, এবার মনে মনে ঠিক করিয়াছেন যে, চাকুরি করিয়া যে দু দশ টাকা পাইবেন, তাহা দিয়াই এক প্রকার সংসার চালাইবেন। রোজ রোজ আর সেই দুর্দ্দান্ত রবি রাজার পীড়ন সহিতে পারিবেন না। করুদ রাজা, আর কয়েদী, উভয়েই সমান।

এই ভাবিয়া, রজনীরঞ্জন রায়, নক্ষত্র সেনা সমভিব্যাহারে বিদেশে যাত্রা করিলেন। শুকতারা ম্লান বদনে চাহিয়া আছে। বিদায় কালে, চারি চক্ষু মিলিত হওয়াতে, কত যে অশ্রুবিন্দু, ভূমিতল অভিষিক্ত করিল— ইয়ত্তা নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে শশাঙ্ক বিদায় হইলেন। শুকতারা কিন্তু তখনও নীরবে চাহিয়া রহিল।

এদিকে একটা সাড়া শব্দ পড়িয়া গেল। বিহগকুল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "উষা জাগো, উষা জাগো, এখনি রবি আসিয়া সবংশে জ্বালাইয়া মারিবে। উষা জাগো।" শুক কাঁদিয়া বলিল, "অভাগীর মেয়ে তোর কি আজ ঘুম ভাঙ্গিবে না? ভাবিয়াছিলাম যে, নভ নগরেই তোকে বিয়ে দিব, কিন্তু তা হ'বার যো নাই, সবাই বলে, ওকে নিয়া ঘর কন্না হইবে না, কি করি? এখনও যে, তোর চপলতা গেল না! শিশিরের জলে চোখ দুটি শীগ্‌গির শীগ্‌গির ধুয়ে আয়। গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। আজ তোকে কুসুম ভূষণে সাজাইয়া দিব— আয় উষা আয়।" উষা তখন শিশিরে চোখ দুটি মাজিল।

শশাঙ্করাজ, এবার মনে মনে ঠিক করিয়াছেন যে, চাকুরি করিয়া যে দু দশ টাকা পাইবেন, তাহা দিয়াই এক প্রকার সংসার চালাইবেন। রোজ রোজ আর সেই দুর্দ্দান্ত রবি রাজার পীড়ন সহিতে পারিবেন না। কয়েদ রাজা, আর কয়েদী, উভয়েই সমান।

এই ভাবিয়া, রজনীরঞ্জন রায়, নক্ষত্র সেনা সমভিব্যাহারে বিদেশে যাত্রা করিলেন। শুকতারা ম্লান বদনে চাহিয়া আছে। বিদায় কালে, চারি চক্ষু মিলিত হওয়াতে, কত যে অশ্রুবিন্দু, ভূমিতল অভিষিক্ত করিল-- ইয়ত্তা নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে শশাঙ্ক বিদায় হইলেন। শুকতারা কিন্তু তখনও নীরবে চাহিয়া রহিল।

এদিকে একটা সাড়া শব্দ পড়িয়া গেল। বিহগকুল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "ঊষা জাগো, ঊষা জাগো, এখনি রবি আসিয়া সবংশে জ্বালাইয়া মারিবে। ঊষা জাগো।" শুক কাঁদিয়া বলিল, "অভাগীর মেয়ে তোর কি আজ ঘুম ভাঙ্গিবে না? ভাবিয়াছিলাম যে, নভ নগরেই তোকে বিয়ে দিব, কিন্তু তা হ'বার যো নাই, সবাই বলে, ওকে নিয়া ঘর কন্না হইবে না, কি করি? এখনও যে, তোর চপলতা গেল না। শিশিরের জলে চোখ দুটি শীগ্গির শীগ্গির ধুয়ে আয়। গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। আজ তোকে কুসুম ভূষণে সাজাইয়া দিব— আয় ঊষা আয়।" ঊষা তখন শিশিরে চোখ দুটি মাজিল।

ঘুমের ঝোঁকে এখনও কোয়াসা কোয়াসা দেখিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ঊষাকে, শুক, একখানি কোমল গোলাপী বসন পরাইয়া দিল এবং ফুলেব চুল, ফুলেব মালা, ফুলেব বালা দিয়া, ঊষার সোণাব অঙ্গ সাজাইয়া দিল। ঊষা, এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

শুকের একটী সতীন আছে। নাম—কুমুদিনী। শুক, ঊষাকে বেশ ভূষায় সুসজ্জিত কবিয়া, সতীনেব নিকট পাঠাইয়া দিল এবং নিজেও প্রস্থান কবিল। একটা সোণাব মেঘে চড়িয়া, ঊষা, ধীবে, অতিধীরে; মর্ত্তে নামিতে লাগিল। কুমুদিনী, ঊষাকে দেখিয়াই ত তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল। ঊষাব সাজ সজ্জা দেখিয়া অবাক। এ যে বিয়েব সাজ। কুমুদিনী বলিল, "পোড়ামুখী, আমাব বাড়ী তোর জায়গা হইবে না। সূর্য্য একেই আমার বংশেব উপর হাড়ে মাসে চটা। এখানে তোকে দেখিলে কি আব রক্ষা আছে?" ঊষা, গোলাপী নেশায় বিভোব হইয়া, গভীর হাসিতে লাগিল। কুমুদিনীব কথায় ভ্রূক্ষেপও কবিল না।

কুমুদিনী মনে মনে ভাবিল, আকাশে ওর বিয়ে হবার যো নাই; কাজেই এখানে আদব জানাতে আসিয়াছে। ও যেমন ঘুমালু মেয়ে: শুকে তেমনি একটা ঘুমালুর কাছে বিয়ে দিতে হইবে। কুম্ভকর্ণ কি মরিয়াছে? যাহোক, একটা ঘটক যোগাড় করা চাই। কুমুদিনী,

ঘটক খুঁজিতে থাকুক। পাঠক, আসুন, আমবা এই অবসবে ইন্দুমতী ও শৈলবালাকে দেখিয়া আসি। উষাব বিযেব সময়, আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ দেওযাইব। তা বলে, আপনাবা এখন হইতেই উপবাস থাকিবেন না। আসুন, আব ওখানে থাকিবেন না।

সেই সুন্দর উষা'ব সময, ইন্দুমতী নিজেব পবিধেয় বসনে, চুলে, সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিতে লাগিল। ভয,—পাছে প্রভাতে কেহ ইন্দুব লাবণ্য দেখিযা, কোন প্রকাব অত্যাচবণ কবে। কিন্তু, মাটি মাখিলে কি হইবে? ইন্দুমতীব লাবণ্য বিভা স্ফটিক পাত্র বিনির্গত আলোব ন্যায়, মাটি ভেদ কবিযা বহির্গত হইতে লাগিল। শৈলবালা, এসব দেখিযা শুনিযা মনে মনে বডই হাসিতেছিল। পবে, প্রকাশ্যে কহিল,

“সই, এ কি কবিতেছ? সোণা'ব অঙ্গ কি মাটিতে ঢাকে?”

ইন্দুমতী, বিবক্তি প্রকাশ কবিল।

শৈলবালা, ইন্দুমতীর বিবক্তি বুঝিতে পাবিল। বুঝিয়াই আব অন্য কথা তুলিল না। কেবল এইটি মনে মনে ঠিক করিল যে, সময পাইলে, একদিন এসমস্ত কথা বলিবে—বলিয়া হাসিবে—হাসাইবে।

ইন্দুমতীর ধূলা মাখা শেষ হইল। তখন উভয়ে পথ ধবিল। প্রায সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত চলিল। পথে যে

ইন্দুমতীকে দেখিল, সেই ভ্রূকুঞ্চিত করিল। ঠিক সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়, তাহারা একটী গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। গ্রাম খানা, ক্ষুদ্র; লোক জন বেশী নাই। লোক জন না থাকিলেও, গ্রামখানা বড়ই সুন্দর! প্রাকৃতিক শোভায় গ্রামে যেন চির বসন্ত বিরাজমান। ইন্দুমতী ও শৈলবালা গ্রামে পৌঁছিয়াই ত বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কোথায়ও থাকিবার স্থান পাইল না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, বাসস্থানের দুর্গতি দেখিয়া, ইন্দুমতীর চোখে জল আসিল এবং পথ-ক্লেশে অত্যন্ত কাতর ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু, মুখ ফুটিয়া, কিছুই বলিল না। মনের কষ্ট মনেই চাপা দিয়া রাখিল। শৈলবালা, ইন্দুমতীর কাতরতা বুঝিতে পারিল। ইন্দুর কষ্টে শৈলবালার চোখে জল আসিল।

রাত্রি যখন চারি ছয় দণ্ড হইযাছে, তখনও ইন্দুমতী ও শৈলবালা বাড়ী বাড়ী করিয়া ঘুরিতেছিল। পরে, তাহাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। ঘুরিতে, ঘুরিতে, একটি ক্ষুদ্র বাড়ীতে উঠিল। সেই বাড়ীতে মাত্র দুখানা খড়ের ঘর; পূর্ব্বে যে আরও দু একখানা ঘর ছিল, এখনও তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাকের ঘরের চালে প্রায়ই খড় নাই, অতি অল্প মাত্র রহিয়াছে। বোধ হয়, তাহাও অতি সামান্য বাতাস হইলেই উড়িয়া পড়িয়া যাইবে এবং ঘরের প্রায় সকল বেড়াই

খসিয়া পড়িতেছে। কেবল কঞ্চিগুলি একে অন্যের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। রান্না ঘরটি ধূমে মসীরূপী হইয়াছে। বাড়ীর চারিদিকে, বড় বড় আম, নারিকেল, খেঁজুর, তাল, সুপারি ও জাম প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী। সেই বাড়ীতে মাত্র দুটি লোক বাস করিয়া থাকে। উভয়েই আবার স্ত্রীলোক। একটি ক্ষুণক্ষুণে বৃদ্ধা; অপরটি শৈলবালার সমবয়স্কা। নাম—মাধুরী। মাধুরী, অনিন্দ্য সুন্দরী; বুড়া—মাধুরীর ঠাকুর মা। বৃদ্ধাটি শয়ন ঘরের বারিন্দায় বসিয়া বসিয়া, পান ছেঁচিতে ছিল। দন্তাভাবে পান চিবাইয়া খাইতে পারে না। পান ছেঁচিতে ছেঁচিতে ডাকিল,

"ও মাধুরী, ও মাধুরী, খেয়েছিস?"

রান্না ঘর হইতে, মাধুরী উত্তর করিল। কহিল,

"খেতে ব'সেছি। আপনি শয়ন করুন।"

বুড়াকে খাওয়াইয়া, মাধুরী নিজে খাইতে বসিয়াছে। বুড়া, পুনরায় কহিল,

"তুই, একাকী ঘাটে যেতে পারিবি?"

মাধুরী, ভাতের গ্রাস মুখে দিয়া বলিল,

"পা-রি-ব।"

ঘাট, বাড়ীর সংলগ্ন।

বৃদ্ধা তখন শয়নার্থ চলিল। সেই সময়, শৈলবালা, কহিল,

"আমরা ছুটি স্ত্রীলোক, আপনাদেব বাড়ীতে থাকিতে পাবিব কি?"

বৃদ্ধা, মাথা নাড়িতে নাড়িতে, গৃহের ভিতরে যাইতেছিল। শৈলবালার কথা শুনিযা, ফিরিয়া চাহিল। বলিল,

"এখানে কোন জায়গা টায়গা হবে না, গো। অন্ত বাড়ীতে যাও।"

এই বলিয়া, বৃদ্ধা গৃহের ভিতবে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধাব কথা শ্রবণ কবিযা, ইন্দুমতী ও শৈলবালা, ফিবিয়া চলিল। কিন্তু পিছন হইতে, মাধুবী কহিল,

"যেযো না, যেয়ো না; বসো।"

এ কথায় ইন্দুমতী ও শৈলবালা, হাতে যেন আকাশ পাইল এবং তাহাদেব প্রাণে জল আসিল; আব ফিবিতে হইল না। মাধুরীব পাতে কয়টা ভাত ছিল। সেগুলি মাধুবী আর খাইল না। তাড়াতাড়ি হাত মুখ প্রক্ষালন করিয়া, ইন্দুমতীব সম্মুখে আসিল। বলিল,

"তোমাদেব বাড়ী কোথা, গো?"

শৈলবালা। মুকুলপুবেব নিকট।

হাঁসিকান্নাব অতি সন্নিকট মুকুলপুব গ্রাম। শৈলবালা, প্রকৃত নাম প্রচ্ছন্ন রাখিল। মাধুরী, তাহাই বিশ্বাস করিল। কহিল,

"এ গ্রামে এসেছ কেন ?"

শৈলবালা, কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া আকুল হইল। পরে, বলিল,

"ভিক্ষা করিতে।"

মাধুবী, অত্যন্ত বিস্মিত হইল। বলিল,

"তোমাদের গ্রামে কি ভিক্ষা মিলে না ? তোমরা কি ভিক্ষা কবে খাও ?

শৈলবালা। মিলিবে না কেন ? কম আর বেশী।

মনে মনে বলিল, "আমাদের গ্রামে মিলে সবই ; কেবল মিলে না—দয়া।"

ইন্দুমতী, একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,

"বোন, আজ আমরা কদিন যাবৎ ভিক্ষার্থী হইয়াছি।"

মাধুবী তখন ইন্দুমতীব গলা জড়াইযা ধরিল। কেন যে ধবিল, বলিতে পাবি না। বোধ হয়, মাধুরী, ইন্দুমতীর কথায় তাহার কোন বেদনা অনুভব করিতে পারিয়াছিল। মাধুবী, বাষ্পাকুলিত লোচনে, গদ্ গদ্ ভাবে কহিল,

"বোন, আমরাও ভিক্ষা করে খেয়ে থাকি। এখন তোমাদিগকে কি করে খাওয়াব? যা ভিক্ষায় পেয়েছিলুম ; তা ত আজ দুবেলায় খেয়েছি। ঘরে আর এক মুষ্টি চালও নেই।"

এই বলিতে বলিতে মাধুরীর চোখের জল টস্ টস্ করিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দুমতী, মাধুরীর বালিকা সুলভ কোমল স্বভাব পরিদর্শন করিয়া, বিমোহিত হইল এবং মনে মনে ভাবিল, সমদুঃখী না হইলে, দুঃখ বুঝিতে পারে না! যে ব্যক্তি কোন দিন চাঁদ দেখে নাই, সে চাঁদের সৌন্দর্য্য কি বুঝিবে? ইহারা অত্যন্ত গরিব লোক এখানে আসিয়া ভাল করি নাই। মাধুরীর কি সুন্দর অনুপম শরীর। যেন শিশির স্নাত প্রসূনটি। যেমন অনুপম দেহের লাবণ্য, কথাগুলিও তেমনি সুমধুর—কেমন যেন স্নেহমাখা। প্রকাশ্যে বলিল,

"বোন, আমরা খাব না। তোমার ভয় নেই।"

মাধুরীর বিলম্ব দেখিয়া, বৃদ্ধা উপর্য্যপরি ডাকিতেছিল। মাধুরী, ছুটিয়া বৃদ্ধার নিকট গেল এবং কাণে কাণে কি কথা বলিল। বোধ হয়, ইন্দুমতীদের থাকিবার কথাই অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল। কহিয়াই ছুটিয়া আবার ইন্দুমতীর নিকট আসিল।

ইন্দু ও শৈল, স্নানার্থ ঘাটে চলিল। সমস্ত দিন স্নান করে নাই। মাধুরী, সেই অবসরে সরিয়া পড়িল।



ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

মাধুবীর প্রয়াণ।

মাধুরী, শৈল ও ইন্দুকে ঘাটে রাখিয়া, গ্রামেব ভিতব চলিল। রাত্রি প্রায় দেড়প্রহর অতীত হইয়াছে। চাঁদ উঠিয়াছে। জগত, পরিষ্কাব জ্যোৎস্নাময়। রাস্তাতে কোনও ভয় নাই; মাধুবী নির্ভয়ে চলিতে লাগিল। রাস্তাটী বড়ই মনোবম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে, সারি সারি বট, অশ্বত্থ, ঝাউ, দেবদারু, নিম ও বাব্‌লা প্রভৃতি বৃক্ষ, শ্রেণীবদ্ধরূপে বিবাজ কবিতেছে। কোন কোন বৃক্ষে ঝিঁঝিঁর দল সমস্ববে ডাকিতেছিল; পাখীর পক্ষ বিলোড়ন শব্দ হইতেছিল। মাধুবী প্রায় ক্রোশেকের পথ হাটিয়া, একটী বাড়ীতে উঠিল। বাড়ীর ভিতবে গেল। ডাকিল,

"মা, মা, আমি মাধুরী এসেছি। উঠে ছুটো কথা শুন, মা।"

মাধুবীর ডাকে, সেই বাড়ীব গৃহিণী উঠিলেন। তিনি মাধুরীকে কন্যাসম আদব করিয়া থাকেন। মাধুবীও,

গৃহিণীকে মাতৃতুল্য ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকে। গিন্নী, বলিলেন,

"কি, গো মাধুরী; এত রাত্তিতে কোথা যাস্? তোর কি ভয় নেই, মা?"

মাধুরী, সাহসের সহিত কহিল,

"ভয় কি, মা?"

গিন্নী, আশ্চর্য্যভাবে কহিলেন,

"বলিস্ কি, মাধুরী, ভয় নেই? ভয় না থাকিলেও কি এত রাত্তিতে আসিতে আছে?"

মাধুরী, বিনম্রভাবে কহিল,

"প্রয়োজন আছে বলেই এসেছি, মা।"

গিন্নী। কাল এলে হ'ত না?

মাধুরী। বিশেষ প্রযোজন—

গিন্নীর হৃদয়ে বাৎসল্যভাবের উদ্রেক হইল। কহিলেন,

"তোমার এমন কি প্রয়োজন, মা?"

মাধুরীও গিন্নীর বাৎসল্য বাক্যে ভুলিয়া গেল। কহিল,

"মা, বাড়ীতে দুটি আত্মীয় এসেছেন। তাঁরা কি খাবে? খাবার যে কিছু নেই, মা? ভিক্ষায় যা পেয়েছিলুম, তা দুবেলায় খেয়েছি। ঘরে আর একমুঠ চালও নেই? এখন উপায় কি, মা?"

এই বলিয়া ছল্ ছল্ নেত্রে, গিন্নীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। গিন্নী, হাসিয়া বলিলেন,

"পাগ্‌লি তার জন্য ভাবনা কি? দাঁড়াও চাল ডাল দিচ্ছি।"

মূহুর্ত্ত মধ্যে, গিন্নী, একটি সাজিতে করিয়া, প্রায় পাঁচ সের চাল ডাল আনিয়া দিলেন। গিন্নী, মাধুরীর কোন অভাব জানিতে পারিলেই, তৎক্ষণাৎ, তাহা বিমোচনার্থ যত্ন করিয়া থাকেন। মাধুরীকে ভিক্ষা করিতেও নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু, মাধুরী লজ্জাবশত রোজ রোজ গিন্নীর নিকট খাবার চাহিতে আসে না।

চাল ডাল নিয়া, মাধুরী দ্রুতপদে বাড়ী আসিল। বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, ইন্দু ও শৈল ঘাটে বসিয়া স্নান করিতেছে এবং স্নান করিতে করিতে কি কথোপকথন করিতেছে। ইহা দেখিয়া, মাধুরী, তাড়াতাড়ি পাক করিতে আরম্ভ করিল। ইন্দু ও শৈল, মাধুরীর এসব ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। ইন্দু ও শৈল, স্নানান্তে বাড়ী আসিয়া, মাধুরীকে ডাকিল। মাধুরী, রান্নাঘর হইতে, সহর্ষে কহিল,

"আমি রান্না করিতে বসেছি; তোমরা ঘরে বসো"।

মাধুরীর মন আনন্দ সাগরে ভাসিতেছিল। কেন মাধুরীর এত হর্ষ, কে বলিবে? এত যে পরিশ্রম, এত যে ক্লেশ, তবুও মাধুরীর শরীরে যেন উল্লাস ধরিতেছে

না। আজ যেন তার বিলুপ্ত শক্তি, পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে। শৈলবালা, সৌজন্য প্রকাশ করিয়া কহিল,

"আমরা কিছু খাব না, মাধুরী?"

মাধুরী, দুঃখিতভাবে কহিল,

"কেন খাবে না, বোন? আমি যে চাল ডাল এনেছি। অবশ্য খেতে হবে।"

শৈলবালা, ঈষৎ হাসিয়া কহিল,

"এই না বলিলে, চাল ডাল নেই?"

মাধুরী, লজ্জিত হইল। কহিল,

"এখনি যোগাড় করেছি।"

শৈল। কোথায় পেলে?

মাধুরী। বলিব না।

তখন মাধুরী, উননে, একখানা কাষ্ঠ গুঁজিয়া দিল এবং ইন্দুমতীর সন্নিধানে আসিয়া বসিল। কিয়ৎকাল বসিয়া, ইন্দুমতীর হাত ধরিয়া, রান্নাঘরে নিয়া গেল। পরে, বলিল,

"তোমার বুঝি খুব ক্ষুধা পেয়েছে? এই ত হ'ল আর কি? বেশী গোণ নেই?"

মাধুরী, আবার উননের কাষ্ঠখানা নাড়িয়া দিল। ভাত টক্ বক্ করিতে লাগিল। ইন্দুমতী কহিল,

"না, আমার ক্ষুধা পায় নি।"

মাধুরী। না, কেন? মুখখানিই ত শুক্ন দেখা যাচ্চে!

মাধুরী, পুনরায় উননে কাঠ গুঁজিয়া দিল। কাঠগুলি দাউ দাউ করিয়া, জ্বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল,

"আমি বুঝেছি; তুমি লজ্জায় কিছু বলিতেছ না।"

ইন্দু। লজ্জা কি? সত্যিই আমার ক্ষুধা নেই।

প্রকৃতপক্ষে, ইন্দুমতীর শোকতাপ পরিপূর্ণ অন্তঃকরণের দরুণ ক্ষুধারও বড় বেশী উদ্রেক হইয়াছিল না। যাহাহউক, অতি সত্বর রান্না সমাপ্ত হইল। সকলেই যৎসামান্য আহার করিল। আহার করিয়া শয়নার্থ চলিল। শয়নকালে, মাধুরী, ইন্দুমতীকে বলিল,

"বোন, আমি তোমায় পেয়েছি?"

ইন্দুমতী, ঈষৎ হাসিল। কহিল,

"পেয়েছ।"

মাধুরী, আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল,

"তোমাকে পেয়েছি?"

ইন্দুমতী, এবারও বলিল,

"পেয়েছ।"

মাধুরীর শরীর হর্ষে রোমাঞ্চিত হইল। বলিল,

"বোন, তবে তোমাকে পেলেম?"

ইন্দু। পেলে।

ইন্দুমতীর কথা শুনিয়া, অমনি মাধুরী, ইন্দুর চিবুক স্পর্শ করিয়া, চুম্বন করিল এবং উভয়ে গলাগলি ধরিয়া, শয়ন করিল।

স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে সহজেই অতি প্রণয় ঘটিয়া থাকে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

কথোপকথন।

ইন্দুমতী ও মাধুবী বিরলে বসিয়া আছে। বসিয়া বসিয়া, কত কি কথোপকথন করিতেছে। ইন্দুমতী, মাধুবীকে সস্নেহে কহিল,

"বোন, আমায় একটী কথা বলিবে?"

মাধুবী, হাসিয়া কহিল,

"কি কথা, বোন?"

ইন্দু। যাই কেন হ'ক না; বলিবে কি না, বল?

মাধুবী। বলিব।

ইন্দু। বলিবে? বোন কথা ত গোপন করিবে না?

মাধুবী। না।

ইন্দু। সত্য?

মাধুবী। সত্য।

ইন্দু। তুমি নিত্য নিত্য রাত্রিতে কাঁদ কেন ?

মাধুরী, রাত্রিতে ইন্দুমতীর পাশেই শয়ন করিয়া থাকে এবং শয়ন করিয়াই, উদ্বেলিত হৃদয়ে, নীরবে নীরবে কাঁদিতে থাকে। ইন্দুমতী, অনেকদিন সেই কান্না টের পাইয়াছে। ভাবিযাছিল, এ ক্রন্দনেব কারণ জিজ্ঞাসা কবিবে। কিন্তু, নির্জ্জনে ভিন্ন যদি মাধুবী মনোভাব প্রকাশ না করে, তন্নিমিত্তই এতদিন জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। অদ্য বিবলে পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল।

মাধুরী, ইন্দুমতীর কথা শ্রবণ করিয়া, মেঘাবৃত নিষ্প্রভচন্দ্রের ন্যায় বিষণ্ণ ও বিবস হইল এবং চকিতের ন্যায় বলিয়া উঠিল। বলিল,

"কৈ, না, বোন ?"

ইন্দুমতী। ছি! আমার নিকট গোপন ?

মাধুবী, লজ্জিতা হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল,

বোন, আমি বড় দুঃখিনী। আমার দুঃখের পারাপাব নেই।

ইন্দুমতী, অবাক হইল। মনে মনে ভাবিল, জগতে আমার হইতেও দুঃখিনী আছে ? প্রকাশ্যে কহিল,

"কেন, বোন ?"

মাধুবী, সকাতরে কহিল,

"স্বামী ব্যতীত স্ত্রীলোকেব সুখ কি ?"

ইন্দুমতী আগ্রহের সহিত কহিল,

"কেন? তোমার কি স্বামী নেই?"

মাধুরী, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। আঁখিতে জল আসিল। কহিল,

"আছেন।"

ইন্দু। তবে তোমার দুঃখ কি?

মাধুরী, সবিষাদে কহিল,

"দুঃখ কি? বলিতে যে প্রাণ ফাটিয়া যায়!"

ইন্দুমতী দেখিল, মাধুরীর আয়তবিস্ফারিতলোচনে বারিবিন্দু টল্ টল্ করিতেছে। পরে, বলিল,

"ব'ল না, বোন। তোমার দুঃখের কথা কি শুনিতে পাব না? আমি কি তোমার কেউ নই?"

আদরে মাধুরীর আঁখি দুটি গলিয়া গেল। গণ্ড দুটি বাসন্তী গোলাপবৎ শিশির স্নাত হইয়া উঠিল। মাধুরী, অনেক দিন যেন, এত আদরের কণ্ঠ শুনিতে পায় নাই। মাধুরী, গলিয়া গেল। একে একে বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল,

"আমার স্বামী, আমার বড় আদরের ধন ছিলেন। তাঁহার দোষও আমার কাছে প্রীতিপ্রদ বলিয়া অনুমান হইত। যদিও কুসংসর্গে পড়িয়া, মাটি হইলেন; তথাপি আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসিতাম। কেন ভালবাসিতাম, বলিতে পারি না। তিনি যে এদিক ওদিক ঘুরিয়া

আসিয়া, আমাব দিকে, এক একবাব চাহিতেন, তাতেই যেন আমাব মন প্রাণ বিকল, বিবশ হইয়া যাইত। তখন আমার ভালমন্দ জ্ঞান থাকিত না। তাঁর সেই তীক্ষ্ণ চাহনি, মরমে প্রবেশ কবিয়া, প্রাণ ধরিয়া যেন টানটানি করিত। হাতের জিনিষ খসিয়া পড়িত; জিনিষ বলে কেন? আমার সমস্ত দেহ যেন থাকিয়া থাকিয়া খসিয়া পড়িতে থাকিত। নিযত তাঁহার কথা শুনিতে ভাল বাসিতাম। তাঁব কথায যেন এমন একটা শক্তি ছিল যে, কথা শুনিলেই হৃদযেব অন্ধকাব কক্ষে, আনন্দেব প্রবাহ ছুটিতে থাকিত। সেই আনন্দে, হাবুডুবু খাইতে খাইতে বিহ্বল হইতাম। কিন্তু, আমাব সেই সুখেব দিন গিযাছে; এখন আমাব কালবাত্রি! সেই দুঃসহ ও উৎকট দুঃখেব জ্বালায় জ্বলিয়া মবিতেছি। তিনি, আমাকে ভালরূপ সুখের অনুপম রমণীয় মুখ দেখিতে দিলেন না। অভাগিনীকে ফেলিয়া, লোকলজ্জা ভয়ে, কোথায় চলিয়া গেলেন, আব তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তিনি আমাকে পবিত্যাগ কবিযা গেলে পব, ভাবিলাম, এ জীবন আর রাখিব না। জীবনে সুখ কি? অনন্ত দুঃখে জীবন পরিপূর্ণ। যেখানে লালসাব অতিশয় প্রলোভন, সেইখানে কি সুখ থাকিতে পারে? লালসাব বিসর্জ্জনই সুখ। আমি সেই মহাভিলাষ ছাড়িতে পারিলাম কৈ? অভিলাষে উন্মত্তবৎ হইয়াছিলাম। স্বামী সোহাগ,

আশাতীত পাইয়াও আরও পাইতে অভিলাষ করিলাম। কথায় বলে, বেশী খেতে করে আশ্, তার হয় সর্ব্বনাশ। আমাব এখন সর্ব্বনাশ—মহা সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

সে দিন, সেই বিষম সর্ব্বনাশের অসহ্য জ্বালা সম্বরণ করিতে না পারিয়া, মরিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু, মরিতে যাইয়া ভাবিলাম, মরিব কেন? নদী জলে ভাঁটা হইলে কি পুনরায় জোয়াব হয় না? ভাঁটার পর জোয়ার হইবেই। এটি প্রাকৃতিক নিয়ম। এখন যদিও ভাঁটাব স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছি, তবুও এমন দিনও হ'তে পারে যে পুনর্ব্বাব আবাব জোয়াবের সময় উধাও হইয়া স্বস্থানে উপনীত হইতে পারি। বোন, মনেব গতির কি পবিবর্ত্তন সম্ভবে না? মানুষের প্রাণ নিয়ত চঞ্চল; পবিবর্ত্তিত হ'তে কতক্ষণ? সেই বিশ্ববিমোহিনী আশার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া, এ জীবন বাখিয়াছি! জীবন রাখিয়াছি সত্য, কিন্তু জীবনে সুখ নাই, শান্তি নাই। কেবল পাঁজব ভাঙ্গিয়া, বুক ভাঙ্গিয়া অনল যেন হু, হু, কবিয়া জ্বলিতেছে। হায়! এ অনল কি নির্ব্বাণ হইবে না?"

এ সময়, ইন্দুমতী কি জানি কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু, মাধুবী, ইন্দুমতীব স্ফুটোন্মুখ মুখে বাঁধা দিল। আবাব বলিল,

"অনেকের মুখে শুনিয়াছি, মরিলে নাকি আকাশের তারা হইয়া থাকে। একদিন এ বিশ্বাসের বশীভূত

হইয়াও মরিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু মরিলাম না। এটি আমার বিশ্বাস হয় না। বিশেষত মরিয়া যদি নক্ষত্র না হইতে পারি, তবে ত আব তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। কাজেই, আমাব মবিবাব সাধ ফুবাইল। মরিতে গিয়া ঘবে ফিবিয়া আসিলাম এবং বিছানায় পড়িয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে, আমাব চিত্ত চাঞ্চল্যের অনেক উপশম হইতে লাগিল। মনে কবিলাম, আমি ভ্রান্ত, শান্তিব নিমিত্ত অন্যত্র যাই কেন? ঘবেই ত শান্তি বিবাজ কবিতেছে। যখন কাঁদিলেই উচ্ছ্বসিত যন্ত্রণার উপযুক্ত উপশম হয়, তখন আব অকালে অপমৃত্যু মবিয়া, অকলঙ্ক কুলে কালি দিতে যাই কেন? শুনিযাছি, অপমৃত্যু মবিলে নাকি মানুষ মেঘ হইযা, এদিক ওদিক ছুটিযা বেড়ায, চিব দিন ঝব্ ঝব্ কবিযা কাঁদে, অনুতাপ কবে, বিজলীব ছুবিকা হৃদযে বিদ্ধ করিযা, ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। বোন, সেই দিন হইতে, বিবলে বসিযা কাঁদিযা থাকি। কাঁদিলেই ববফ তুল্য জমাট দুঃখটা কিছু নবম হইযা আসে। দুঃখটা যেন বড়ই সুখের সামগ্রী বলিয়া উপলব্ধি হয়। আজ কদিন যাবৎ তোমাকে পাইয়া, আমাব যেন নূতন জীবন হইয়াছে। সকল কার্য্যেই খুব উৎসাহ উদ্যম লাগিতেছে এবং সকলি ভাল বোধ হইতেছে। বোন, সেই দিন যদি তুমি এখান হইতে চলিয়া যাইতে, তবে বুঝি আমি

বাঁচিতাম না। (ইন্দুমতী ও শৈলবালা ইহার ভিতর এক দিন অন্যত্র যাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু, মাধুবী যাইতে দেয নাই।) আমবাও এক দিন বড় মানুষ ছিলাম; আমাদেবও দালান কোটা ছিল। কিন্তু, তাহার কুৎসিৎ আচবণে, আমাদেব বিষয় সম্পত্তি, বাড়ী ঘব, অন্যে নিযা গিযাছে। বিষয় বিভব দিয়াও যদি তাঁহাকে ঘবে রাখিতে পাবিতাম, তবুও সুখেব পরিসীমা ছিল না। এ দুঃখও সুখেব বোধ হইত। ধন দিযা কি কবিব? জন থাকিলে, ধন আপনি আসিত। যাঁব ধন, সেই যদি না বাখিল, তবে কে বাখিবে?”

এই বলিতে বলিতে, মাধুবী, উদ্বেলিত হৃদযে কাঁদিতে লাগিল।

ইন্দমতী মাধুবীব গভীব ভালবাসা, সবল ও সকরুণ হৃদযখানি অবলোকন কবিয়া, বিস্মযাবিষ্ট ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অন্তঃবে অন্তঃবে, মাধুবীকে যথেষ্ট প্রশংসা কবিল। প্রকাশ্যে সান্ত্বনা বাক্যে কহিল,

“কেঁদো না, বোন, কেঁদো না। কেঁদে লাভ কি?” মাধুবী, নীবব। কিন্তু, অশ্রুবিন্দু পড়িতেই ছিল। অশ্রু কাহার কথা শুনে না। আপনি আসে, আপনিই ঝবে, আবাব আপনি যায়।

ইন্দুমতী স্বীয় অঞ্চলে, মাধুবীর অশ্রুজল মুছিয়া দিল। পরে, বলিল,

"তোমার স্বামী, কতদিন যাবৎ তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন?"

মাধুবী। প্রায় ছয় বছর।

ইন্দু। এ ছ'বছরে মধ্যে তাঁর কোন সংবাদ পাও নেই।

মাধুবী। না।

ইন্দু। তাঁর অন্বেষণে লোক পাঠায়েছিলে?

মাধুবী, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,

"সে আর একবার ক'রে? কতলোক যে কত স্থানে খুঁজিতে পাঠায়েছিলুম, বলিতে পারি না। এমন কি আমিও ভিক্ষা করিতে করিতে কতস্থান খুঁজেছি; কিন্তু কোথায়ও দেখা পেলুম না। উঃ, কি সুন্দর মুখকমল! কেমন লোচন যুগল!! কেমন অমৃতোপম কথা!!! ইচ্ছা হয়, এখনি একবার দেখে আসি—"

এই বলিয়া, মাধুবী, কয়েকপদ অগ্রসর হইল।

ইন্দুমতী, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, মাধুবীকে ধরিল। বলিল,

"মাধুবী, তুই কি উদ্ভ্রান্তা হ'লি?"

মাধুবী, লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—○—

নূতন যোগী।

একদিন অপবাহ্নে, মাধুবীদেব উঠানে বসিযা ইন্দুমতী, মাধুরী, শৈলবালা ও আর কতকগুলি প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোক গল্প ও রহস্য করিতেছিল। প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকগুলি মাধুবীদেব বাড়ীতে বেড়াতে আসিযাছিল। ইন্দুমতীর মন কিন্তু এ বহস্যে নিবিষ্ট ছিল না। সর্ব্বদা ইন্দুব যে ভাবনা, যে চিন্তা, তাতেই অভিভূত ছিল।

প্রতিবাসিনীদিগেব ভিতব, কেহ বলিলেন, আমাব ছেলেব সঙ্গে, শ্যামনগবেব জমিদাব বাবুব কন্যাব সহিত বিবাহেব কথা হইয়াছিল। কিন্তু, কন্যা কুৎসিৎ বলিযা, আমাব তিনি নিষেধ কবিয়া পাঠাইয়াছেন। কেহ বলিলেন, আমার ছেলে বি, এ, পাশ। লক্ষ গণ্ডা লোক, আমাদেব বাড়ীতে কাঁদিযা যাইতেছে। আমবা ভ্রূক্ষেপও

করিতেছি না। বড়সী ফেলিয়া বসে আছি। নগদ ১০,০০০৲ টাকা, ২৫০৲ টাকার ঘড়ি চেন, ৫০০৲ টাকার অঙ্গুরী দিতে পারে, এমন মাছে ধরিলেই বড়সীতে টান দিব। কোন রমণী, ব্যথিত প্রাণের সহিত বলিলেন, আমি ত ভাই ঘড়ি চেন দিয়াও ভাল ছেলে পাইতেছি না। কেহ বলিলেন, ওপাড়ার পুলিন বাবুর কন্যা, কুসুমের খুব বয়স হইয়াছে। এখন আর ঘরে রাখিলে, মান থাকিবে না। কেহ বা বলিলেন, যে দিন কাল পড়িয়াছে, এতে কি আর লোকের মান ইজৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকিবে? পৃথিবী, রসাতলে যাইবার উদ্যোগ হইয়াছে। রসাতলে যায়ও ত না।

প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকগুলি, এ প্রকার কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়, একটী যোগী, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সকলেই যোগীর পানে চাহিল। দেখিল, এক অপূর্ব্ব সুন্দর যোগী; যোগীর তেজঃপুঞ্জ বপুঃ, প্রলম্বিত জটাভার, প্রশস্ত ললাট; আয়ত সুবিশাল লোচন যুগল, বিস্তৃত বক্ষ, সুদীর্ঘ ভুজযুগল, গলে রুদ্রাক্ষের মালা দোলায়মান, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বিভুতি মাখা অঙ্গ, হস্তে ত্রিশূল। যোগীকে দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল— অনেকে প্রণিপাত করিল। যোগী, ইঙ্গিতে সকলকে নিষেধ করিলেন। মাধুরী, তাড়াতাড়ি একখানা কুশাসন আনিয়া, যোগীকে বসিতে দিল এবং গভীর প্রীতি ও

ভক্তিব সহিত, যোগীব পায পড়িয়া প্রণাম কবিল। যোগী, মাধুবীব হাত ধবিয়া উঠাইল। উঠাইয়া নিজে মাধুবী প্রদত্ত কুশাসনে বসিলেন।

স্ত্রীলোকগুলি, তখন যোগীকে ঘেরিয়া বসিল। যোগীব নিকট বসিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না। একটী মধ্যমবয়স্কা স্ত্রীলোক বসিযাই জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, আমাব বড় ছেলে শীঘ্র দেশে আসিবে কি? এ বমণীব দেখাদেখি কালীতাবা কহিল, ঠাকুব, আমাব খুকীর জ্বর পীলা হইযাছে, কিসে ভাল হ'বে? তবঙ্গিণী জিজ্ঞাসা কবিল, ঠাকুব, এবাব আমাব বোন দিদিব কি হবে, গো? মাখন জিজ্ঞাসা কবিল, ঠাকুব, আমাব দেবব শীঘ্র বাড়ী আসিবে ত? মাখন, চিঠি পাইযাছে যে, তাঁব স্বামী ও ঠাকুবপো, একত্রে বাড়ী বওনা হইয়াছেন। বোধ হয়, মাখন, লজ্জাবশত দেববেব নাম দিয়া, স্বামীব আগমন বার্ত্তা জানিবাব অভিলাষ কবিল। মাতঙ্গিনী প্রশ্ন কবিল, আমাব খোকাটিব ত কোন অসুখ বিসুখ হইবে না? যামিনী কহিল, ঠাকুব, আমাব দিদিব সন্তান হয় না, একটী ঔষধ দিবেন? ঔষধেব কথা শুনিয়া, ভামিনী, দামিনী, কামিনী, ধনী, রামমণি, কৃষ্ণমোহিনী, বিলাসিনী, সুহাসিনী, নিতম্বিনী, রাসমণি, বিনোদিনী, বিধুবদনী প্রভৃতি বমণীগণ, সকলেই একে একে, কেহ ছেলে হওয়ার নিমিত্ত, কেহ ভগ্নীর জন্য,

কেহ স্বামী বশীভূত করিবার জন্য, কেহ সন্তানের অসুখের নিমিত্ত, ঔষধ চাহিতে লাগিল। যোগী, এ পর্য্যন্ত গণ্ডগোলের নিমিত্ত, কাহার কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নাই। উত্তর দিবারও কোন সুযোগ ছিল না। কারণ, স্ত্রীলোকগুলির উপর্য্যুপরি প্রশ্ন হওয়ার দরুণ, একটী যেন হাট মিলিয়াছিল। কে যে কি বলিতেছিল, যোগী তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না। বিশেষত কাহার কথা, কেহ বুঝিতেও পারিতেছিল না।

যোগীকে নীরব দেখিয়া, রমণীগণও নীরব হইল। শৈলবালা, কথা বলিবার সুযোগ বুঝিল। বলিল,

"ঠাকুর গণিতে জানেন?"

যোগী, ঘাড় আন্দোলিত করিয়া কহিলেন,

"জানি। কেন? কিছু গণিতে হবে নাকি?"

শৈলবালার কথায়, যোগীকে উত্তর প্রদান করিতে দেখিয়া, রমণী মহলে, আবার তুমুল গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। সকলেই শৈলবালাকে দিয়া, নিজ নিজ কথা, জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, কেহ শৈলবালার অঞ্চল, কেহ হাত, কেহ চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল। শৈলবালা তখন বিষম উৎপাতে পড়িল। এ সব দেখিয়া, যোগী মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর, শৈলবালা, সকলকে আশ্বাস দিয়া, শান্তি সংস্থাপন করিল। পরে, যোগীর পরীক্ষার্থ মাধুরীকে দেখাইয়া কহিল,

"ঠাকুর, ইহার নাম কি?"

যোগী, কুসুম হাসি হাসিলেন। কহিলেন,

"মাধুবী।"

শৈলবালা, আশ্চর্য্যান্বিত হইল। মাধুবী কিন্তু যোগীর স্ফুটোন্মুখ হাসি দেখিয়া, যোগীব পানে অনিমিক্ লোচনে চাহিয়া বহিল। শৈলবালা, কি অন্য কোন বমণী, বোধ হয, সেই হাসি দেখিয়াছিল না। যোগীব মুখে হাসি দেখিলে, কে যে কি ভাবিত, তাহা ভগবানই জানেন। যোগী, আবার কহিলেন,

"প্রায় মাসেক হইল, মাধুবীব ঠাকুব মাব মৃত্যু হইয়াছে।"

বস্তুত প্রায় একমাস হইল, মাধুবীব ঠাকুব মা, এ সংসাব লীলা পবিত্যাগ কবিয়া গিয়াছেন। যোগীর কথা শ্রবণ কবিয়া, শ্রোত্রীবর্গ বিস্ময়ে অবাক হইল। ক্রমশ যোগীব উপব অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন বমণীগণ, একে অন্যেব সহিত যোগীব গুণপনা সম্বন্ধে নানা প্রকাব কাণাকাণি করিতে আবম্ভ কবিল। শৈলবালা আবাব কহিল,

"মাধুরীব স্বামী জীবিত আছেন কি, ঠাকুর?"

শৈলবালা, মাধুবীর সকল কথা, ইন্দুমতীব প্রমুখাৎ শুনিয়াছিল।

যোগী, গম্ভীরভাবে কিছুকাল থাকিয়া কহিলেন,

"আছেন।"

মাধুবী, তখন একাগ্রচিত্তে, যোগীর কথা ও কণ্ঠস্ববেব প্রতি লক্ষ্য কবিতে লাগিল এবং যোগীকে উত্তমরূপ নিরীক্ষণ কবিতেও ছাড়িল না। যোগীকে দেখিতে দেখিতে যেন বিষণ্ণ হইতে লাগিল। এদিকে শৈলবালা জিজ্ঞাসা কবিল,

"মাধুবীব স্বামী কি আব দেশে ফিবিবেন না ?"

যোগী তখন চতুবতা কবিতে আরম্ভ কবিল। একবাবেই কথার উত্তব দিল না। কেহ যেন কিছু বুঝিতে না পাবে, এমতভাবে মাটিতে খড দিয়া আঁক দিতে আবম্ভ কবিল। মুখে চিন্তাব ছাযা ফেলিল। পবে, আঁক দিতে দিতে কহিলেন,

"না।"

মাধুবী, একেই ববি-কিবণ-বিদগ্ধ বিষণ্ণ নলিনীবৎ। যোগীব কথা শ্রবণ কবিয়া, আবও মলিন ও বিমর্ষ হইল। তথাপি সেইস্থানে যোগীকে কিছু জিজ্ঞাসা কবিল না, না কিছু বলিল না। কেবল, শৈলবালাই সকাতবে কহিল,

"কেন, ঠাকুব ?"

যোগী, অবহেলাব সহিত বলিল,

"অভিকচি নেই বুঝি।"

মাধুবী তখন সেইখান হইতে উঠিয়া গেল। শৈলবালা, আবাবও বলিল,

"মাধুবীর ভাগ্যে কি তবে সুখ নেই ?

যোগী, ধীবে অথচ উদারভাবে কহিলেন,

"মানুষে সুখ দুঃখেব কথা বলিতে পারে না। এখানে আমবা চিরান্ধ! অদৃষ্টে থাকিলে সুখ ঘটিতেও পাবে।"

শৈলবালা, ঈষৎ হাসিয়া কহিল,

"শুনেছি, যোগীগণ ত্রিকালজ্ঞ! আপনিও ত একজন মহাযোগী। তবে, আপনি বলিতেছেন না কেন?"

যোগী, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিলেন,

"সুখ দুঃখ পবিবর্ত্তনশীল। একেব অবসানে অন্যেব অভ্যুদয। তবে কি না মা, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে, কেহ সুদীর্ঘকাল, কেহ বা অতি অল্প সময় সুখ-দুঃখ ভোগ কবিয়া থাকে।"

এই বলিযা, যোগী প্রস্থান করিলেন। অন্য কোন রমণীব কোন কথাবই উত্তব দিলেন না। তখন বমণী মহলে, যোগীব যথোচিত নিন্দা হইতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

— ১ —

সরসী তীরে।

ফুট্ ফুট্ জোছনা রজনী। জগত, শশাঙ্কের নিভাঁজ কিরণ প্রভায় ঢল ঢল—বড় প্রফুল্ল। আকাশের গায় তারা ফুটে নাই; কেবল দুই চারিখানি নিখুঁত শুভ্র মেঘখণ্ড, চাঁদের উপর দিয়া, এলোমেলো তুলা রাশির ন্যায় গড়াইয়া গড়াইয়া যাইতে লাগিল। চাঁদ, চোরের মত জলদের বাড়ীতে, ধীরে ধীরে সিঁদ কাটিতে লাগিল; আবার বাহিরে আসিয়া একটু এদিক ওদিক দেখিয়া গেল। জলদ ভারি হুসিয়ার লোক; বিদ্যুতের অসি বক্ষে করিয়া নিদ্রা যায়। শশাঙ্ক, জলদের বাড়ীতে চুরি করিতে অপারগ হইয়া, ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

একটী সরোবরের চারি পারে, সারি সারি বৃক্ষাবলী বিরাজিত। বৃক্ষগুলির ঘন ঘন ডালায়, পাতায় একে অন্যের সহিত বড় কোকাকুলি। পাতা ও শাখার মাঝে মাঝে, দুই একটী ক্ষুদে ক্ষুদ্র ছিদ্র। সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া, শশাঙ্ক-কিরণ, বৃক্ষতলে নিপতিত হইয়া, স্থানে স্থানে রজত শয্যা নির্ম্মাণ করিয়াছে। বৃক্ষ পত্রগুলিতে চাঁদের কিরণ পড়াতে, রজত পত্র বলিয়া ভ্রম হইতেছিল এবং বায়ুভরে তির্ তির্ করিয়া দুলিতেছিল। সরসী বক্ষে, কুমুদ, কমল, কহ্লারের মহামেলা বসিয়াছে। কোনটা ফুটোন্মুখ, কোনটা ধীরে ধীরে ফুটিতেছে, কোনটি আবার ফুটিয়া বেহুস্ হাসিতেছে। মৃদুল পবন বিতাড়িত জলোচ্ছ্বাসে, সেই প্রস্ফুটিত মুকুল প্রভৃতির প্রতিবিম্ব, কখনও সুদীর্ঘ, কখনও হ্রস্ব, কখনও বা খণ্ডিতভাবে বারির ভিতর প্রতিফলিত হইতেছিল।

সেই সরোবরের পারের বৃক্ষতলে নিরাশ্রয়া একটী রমণী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। শশধরের সুস্নিগ্ধ কিরণ, রমণীর মুখমণ্ডলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, মুখখানির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। একে ত মুখখানি নিটোল, চাঁদপানা, তাতে আবার চাঁদের কিরণ; যেন সোনায় সোহাগার সমাবেশ হইল। চাঁদে কলঙ্ক আছে; কিন্তু এ রমণীর মুখখানি নিষ্কলঙ্ক—নিখুঁত; বিক্ষিপ্ত কেশপাশ; গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। মুখেও গভীর বিষাদের কালো ছায়া

পড়িযাছে, তবুও মুখখানি সুন্দর—সৌন্দর্য্য যেন আরো ফাটিযা বাহিব হইতেছে।

সেই জোছনা বজনীতে, সেই বৃক্ষতল দিয়া, একটী যুবক যাইতেছিল। জ্যোৎস্না রাত্রি বলিয়া, যুবক, নির্ব্বিঘ্নে গমন কবিতেছিল। কিন্তু, যুবকের প্রতি পদ বিক্ষেপই, যুবক যেন গভীব ভাবনাক্রান্ত, তাহার পবিচয দিতেছিল। এক পায়েব পব, অপব পা যেন বড়ই কষ্টে পড়িতেছিল। পায় যেন শক্তি নাই—অবশ। চিন্তা নিপীড়িত যুবকেব পাযেব বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেব অগ্রভাগ, দৈবাৎ বমণীব শবীবে সংস্পর্শ হইল। যুবক, অন্যমনস্ক হইযা যাইতেছিল। হঠাৎ বমণীব দেহে পা সংস্পর্শ হওয়াতে, নিম্নদিকে চাহিল। চাহিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তার সম্পূর্ণ আত্ম বিভ্রম জন্মিল। দেখিল, একটী বাতাহত বৃন্তচ্যুত শুভ্র-কুসুম-কোরক যেন মাটিতে পড়িয়া, গড়াগড়ি যাইতেছে। প্রগাঢ় নীলাকাশেব ভিতবে ভিতবে, শুভ্রমেঘ যেমন অনুপম সুন্দব দেখায়, বিক্ষিপ্ত-কুন্তলা যুবতী ততোধিক রমণীয় বলিয়া প্রতীযমান হইতে লাগিল।

এ যুবতী, যুবকেব পবিচিত। এইপ্রকার স্থানে, এই ভাবে নিদ্রাগত অবলোকন কবিয়া, যুবকেব মনে ভয়েব উদ্রেক হইল। অত্যন্ত ব্যগ্রতাব সহিত যুবতীর মস্তকটি, নিজেব হাঁটুব উপব বাখিল এবং বিক্ষিপ্ত কেশপাশ গুছাইয়া গুছাইয়া সুন্দর কবিতে লাগিল। হঠাৎ

যুবতী, "উঃ" কবিয়া উঠিল। যুবক, তাড়াতাড়ি মাথাটি হাঁটু হইতে নামাইয়া বাখিল। মাথাটি মাটিতে বাখিল বটে, কিন্তু প্রাণে বিষম বাজিল। প্রাণেব ব্যথায়, উড়ানীখানা, মাথার নিচে দিয়া রাখিল এবং সতৃষ্ণ লোচনে, যুবতীব পানে চাহিয়' রহিল। যুবতী পুনবায় যন্ত্রণায় "উঃ উঃ" কবিয়া উঠিল। যুবক বুঝিল, যুবতী বিষম যন্ত্রণাব হস্তে নিপতিত। যুবক, বিহ্বল। একবাব ইচ্ছা কবিল, বমণীব নাম ধবিয়া ডাকে; কিন্তু, লজ্জা আসিয়া তখনি সেই অভিলাষের পথে বাধা দিল। লজ্জাব উৎপীড়নে ভালমন্দ বিচাব শক্তি অন্তর্হিত হইল। যুবক তখন আর এ কুসুম ধূলি বিলুণ্ঠিত দেখিতে পাবিল না। যুবতী যতই বেদনা সূচক কাতবোক্তি প্রকাশ কবিতে লাগিল, যুবকেব প্রাণেও ততই শেল বিধিঁতে লাগিল। যুবক আর সহ্য করিতে না পাবিয়া, ব্রীড়া বিমিশ্রিত অস্ফুটস্ববে ডাকিল, "শৈ——"

যুবকের মুখে আব কথা ফুটিল না। যুবকের এই আজ প্রথম সম্বোধন।

বমণী তখন যন্ত্রণায় পাশ ফিরাইল। যুবক, এবাব যুবতীব মুখের নিকট মুখ নিয়া ডাকিল,

"শৈল, ও শৈ——"

যুবক, এবাবও বেশী কিছু বলিতে পাবিল না। যদিও বেশী কিছু, বলিতে পাবিল না; তথাপি এ সম্বোধনে

যুবতী ঈষৎ চোখ মেলিয়া চাহিল। দেখিল, তারাকান্ত সম্মুখে বসিয়া আছে। যুবতীর বেদনা পূর্ণ প্রাণে তখন হর্ষের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। আবার চাহিল, এবার উভয়ে উভয়েব চোখে চোখে পডিল,—চারিচক্ষু একত্রে মিলিত হইল। সে চোখে, পলক নাই—বিরাম নাই; যেন নির্বাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপ তুল্য স্থির দৃষ্টি! এ দৃষ্টিতে শৈল ও তারাকান্তের হৃদয়, সাগর মন্থনের ন্যায় মথিত হইতে লাগিল। কিন্তু, কেহ কোনরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিল না। শৈলবালা, তৃষ্ণায় অত্যন্ত আকুল হইয়াছিল। কাজেই, কাতরকণ্ঠে কহিল, "প্রাণ যায়, জল!"

তারাকান্ত, তাড়াতাড়ি সরোবর হইতে অঞ্জলিনিবদ্ধকরে জল আনিয়া, শৈলবালার মুখে ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিল। শৈলবালা, তারাকান্ত প্রদত্ত জলপান করিয়া, কিছু সুস্থির হইল। শৈলবালার নির্ব্বাণোন্মুখ প্রাণে শক্তিসঞ্চার হইতে লাগিল। তারাকান্ত তখন শৈলবালাকে উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,

"শৈল, এখানে কেন?"

যুবতী বিষাদে বিবর্ণ হইল। সবিষাদে কহিল,

"ইন্দুমতীকে খুঁজিতে এসেছিলাম।"

তারাকান্ত, আশ্চর্য্যভাবে কহিল,

"ইন্দুমতীকে খুঁজিতে কেন? ইন্দুমতী কোথায়?"

তখন শৈলবালা, সংক্ষেপে অথচ ধীরে ধীরে বলিল,

"আমরা যে বাড়ীতে থাকিতাম, আজ কয় দিন হয়, সেই বাড়ীর মাধুরী কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাই, তাঁহাকে সেই দিন অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত গ্রামে গিয়াছিলাম; ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই বাড়ীতে ইন্দুমতী নাই। না দেখিয়া ভাবিলাম যে, বোধ হয় নিকটেই কোন বাড়ীতে মাধুরীর অন্বেষণার্থ গিয়াছে, এখনি হয়ত ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু, ইন্দুমতী আব ফিবিল না। গ্রাম হইতে ফিবিয়া আসিতে আমার কিছু রাত্রি হইয়াছিল। আজ প্রায ৪।৫ দিন যাবৎ অবিশ্রান্ত কত খুঁজিতেছি, কোথায়ও ইন্দুমতীকে পাইতেছি না। এখন আমাব বোধ হইতেছে যে, ইন্দুমতীব অপরূপ রূপ দেখিয়া, হয়ত কোন নবপিশাচ তাহাকে লইযা গিয়াছে।"

এই বলিয়া, শৈলবালা রোদন করিতে লাগিল। তারাকান্তও শৈলাবলার কথা শ্রবণ করিয়া, ইন্দুমতীব নিমিত্ত দুঃখিত ও ভাবনাক্রান্ত হইল। আর বুঝিল, ইন্দুমতীর অন্বেষণ-জনিত ক্লেশেই শৈলবালাব অজ্ঞানাবস্থা ঘটিযাছে। এ অনুমান যথার্থ। তারাকান্ত, মাধুরীব পবিচয় উল্লেখ কবাতে, শৈল, অন্য সময়ে বলিবে বলিল। তারাকান্ত, আর কিছু না বলিয়া, শৈলকে সঙ্গে কবিযা, বাসস্থানে চলিয়া গেল।

---o---

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০:::০—

প্রেমালাপ।

তারাকান্ত ও শৈলবালা, উভয়েই যেন এখন কেমন কেমন। উভয়েরই প্রাণে কত কি কথার উদ্রেক হয়, আবার কত কি কথা নিবিয়া যায়। যখন যাহার চক্ষু যাহার দিকে পড়ে, সেই খর দৃষ্টিতে ঈষৎ চায় চায়, অমনি আঁখি যুগল নত হইয়া পড়ে। আঁখিতে আঁখিতেও কথা হইতে পারে না! এ রাজ্যের শত্রু কে?

তারাকান্তও শৈলবালার কথা মত, ইন্দুমতীর নিমিত্ত অনেক অন্বেষণ করিল। প্রথমে মাধুরীদের বাড়ী; তারপর সেই বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ যত বাড়ী ছিল, সেই সমস্ত বাড়ী ঘর, শেষে এমন কি গ্রাম খানি তন্ন তন্ন করিয়া

খুঁজিল; কিন্তু ইন্দুকে কোথাযও পাইল না। সকল পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া, উভয়ে আকুল ও দুঃখিত হইল। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে কবিতে, তাবাকান্তেব শবীব ভাঙ্গিয়া পড়িল। হঠাৎ একদিন ঈষৎ জ্বব হইল। শৈলবালা, তাবাকান্তেব সম্মুখে বসিয়া, প্রখর দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল, তাবাকান্তেব মুখকান্তি রুক্ষ হইয়াছে; শবীব, কিছু বিবর্ণ। শবীবে হাত দিযা, জ্ববেব তাপ দেখিবাব অভিরুচি জন্মিল। কিন্তু, সাহস হইল না। ভাবিল, মানুষেব সুখ কি? মানুষ ত বেহুস্। দিবানিশি হায় হুতাশে বিজড়িত। মানুষেব পবাণে, এত জ্বলনি, এত পুড়নি কেন? পাখী, কেন আসে? কেন চলিয়া যায়? কোথায় যায়? কি কবে? কেন কাঁদায়? কেন উড়িয়া যায়? উড়িয়া যায় ত আব দেখা দেয না কেন? দেখা দিতে দোষ কি? মানুষের এ ভাবনায় চোখে জল বহিতে থাকে। ফুল ছুঁইতে চায়, কাঁটাব জ্বালায় পাবে না। না ছুঁইতে পাবিযা, বুকেব যন্ত্রণায ছট্ ফট্ কবে কেন? বিধুব বিধুবদন দেখিযা, ধবিবাব স্পৃহা জন্মে। কিন্তু, সুদূব স্পর্শ বলিয়া, সেই মনোবথ পূর্ণ হয় না। অমনি মানব কত কি স্বপ্ন দেখে, কত কি প্রলাপোক্তিতে জীবনোৎসর্গ কবিয়া থাকে। তবে আব মানবেব প্রাণে সুখ কি? তারাকান্ত; তাবাব—কান্ত! আমাব কিছু নও কি? তবে আর আমি

তোমায় স্পর্শ করিব না কেন? জগতে এই ত পরম সুখ। এ ভিন্ন মানুষের প্রাণে আর অন্য সুখ আছে কি?

এই ভাবিয়া, শৈলবালা, পুনরায় তারাকান্তের গাত্রে হস্তার্পণ করিতে গেল। কিন্তু, পারিল না। হাত যেন অবশ হইয়া আসিল। পরে, বলিল,

"বড় জ্বর হয়েছে বুঝি?"

তারাকান্ত, তাহার ন্যায় মিটি মিটি হাসিল। বলিল,

"জ্বর হয়েছে বটে; কিন্তু, এ জ্বরেও সুখ আছে।"

শৈলবালা, একথা বুঝিযাও যেন বুঝিল না। কহিল,

"জ্বরেতে কি সুখ হয়? এ কিরূপ জ্বর?"

তারাকান্ত, সহাস্যে কহিল,

"না হবে কেন? তুমি যেখানে, স্বর্গও সেখানে। স্বর্গে কি আরাম ব্যারাম থাকিতে পারে? স্বর্গ যে শান্তির অনন্ত ধাম!"

শৈল, নীরব হইয়া রহিল। কেবল সলজ্জ ভাবে অনিমিক্ লোচনে, তারাকান্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারাকান্ত পুনশ্চ বলিল,

"শৈল, এভাবে চাহিয়া রহিলে যে?"

শৈলবালার এতদিনে প্রাণ খুলিল। বলিল,

"চাহিতে যে সাধ যায়?"

তারাকান্ত। কেন? এতো কোন দেখিবার সামগ্রী নয় যে, চাহিয়া থাকিতে অভিলাষ জন্মিবে?

শৈল। এ দেখিবার সামগ্রীই বটে। কিন্তু, কেন যে চাহি, বলিতে পারি না।

তারাকান্ত, শৈলবালার দেখিবার অদম্য স্পৃহা বুঝিল। বলিল,

"চাহিতে কি বড় অভিরুচি হ'য়েছে?"

শৈলবালা, ব্রীড়ায় সঙ্কুচিত হইল। অস্ফুটস্বরে কহিল,

"হ্যাঁ।"

তারাকান্ত, সাগ্রহে কহিল,

"এসো; তবে দুজনেই চাহিয়া থাকি?"

শৈল। চাও তবে। সেটি আরও ভাল।

তারাকান্ত, চাহিতে যাইতেছিল; কিন্তু কি একটী কথা তখন তার মনে পড়িল। বলিল,

"চাহিবার পূর্ব্বে একটী প্রতিজ্ঞা করিলে হয় না?"

শৈলবালা, চকিতের ন্যায় হইয়া উঠিল। বলিল,

"কি প্রতিজ্ঞা?"

তারাকান্ত, ঈষৎ হাসিয়া কহিল,

"যার অগ্রে পলক পড়িবে, সে একটী মনোজ্ঞ জিনিষ দান করিবে।"

শৈলবালার প্রাণে, হাসির তরঙ্গ খেলিল। মুখে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ফুটিল। কহিল,

"কাহাকে দান করিতে হইবে?"

তারাকান্ত। জয়ীকে।

শৈল। উত্তম।

তখন শৈল ও তাবাকান্ত, এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে এক সুন্দর দৃশ্য! কাহারও পলক পড়িতেছে না—উভয়ে নিস্পন্দ। উভয়েই ভাবিতেছে, যার অগ্রে পলক পড়িবে, সেই বুঝি কোন একটা স্বর্গীয় সুখ হইতে বিভ্রষ্ট, প্রবঞ্চিত হইবে। উভযেব মনেই আনন্দ-বাশি, উত্তাল তবঙ্গমালাব ন্যায় উৎপ্লুতভাবে ক্রীড়া কবিতেছিল। সে ক্রীডাব বিবাম নাই—অবিবাম। তাবাকান্ত ও শৈল, সেই আন্দোলিত তবঙ্গে উৎফুল্ল হইযা, বিহ্বলের ন্যায় হইল। তাহাবা যেন ভাসিযা, ইহসংসার ছাড়িয়া চলিল; ভাসিতে ভাসিতে বড় সঙ্কটস্থলে আসিযা পড়িল। উভযেব অাঁখিব দুই পাবেই, পাব সমান জল হইল। একটু, আব একটু জল বাড়িলেই, পাব উছলিযা জল প্রবাহিত হইবে।

কিন্তু, একি! শৈল, একি! তোমাব যে সাশ্রু পলক পড়িল? তুমি কোমল, কঠিনেব সঙ্গে পাবিবে কেন? তোমাব এ প্রতিজ্ঞা উপযুক্ত হয় নাই। প্রতিজ্ঞা উপযুক্ত হউক, আব নাই হউক, শৈলবালা কিন্তু মনোজ্ঞ জিনিষ, তারাকান্তকে উপহাব দিবার জন্য খুঁজিতে আবম্ভ কবিল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভবিয়া, কত জিনিষ, কত কি খুঁজিল; কিন্তু কিছুই প্রাপ্ত হইল না। যে জিনিষ দিলে, তারাকান্ত পরিতুষ্ট হইবে, জগতে সে জিনিষ কি ছিল না?

তারাকান্ত, শৈলবালার ‹লক্ষ পড়িতে দেখিয়া উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল। বলিল,

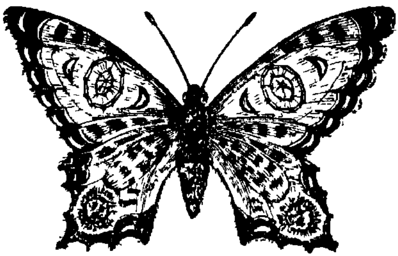
"কৈ, আমার মনোজ্ঞ জিনিষ ?''

শৈলবালা, তারাকান্তের মনোজ্ঞ জিনিষ, এ জগতে না পাইয়া অগ্রেই একটী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। তারাকান্ত, চাহিবা মাত্র, তাহার দক্ষিণ হস্তখানা, আপনার বক্ষের উপর টানিয়া নিল। পরে, বলিল,

"এই ধর, আমার হৃদয়। এখানে প্রাণ মন সকলি আছে। যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই গ্রহণ কর।"

তারাকান্ত, শৈলবালার নিষ্কলঙ্ক কপোলে, একটী মধুর চুম্বন করিল।

শৈলবালা, কি যেন হইয়া গেল।



একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

পথে আলাপ।

শীত, যায় যায়;—বসন্ত উদয়োন্মুখ। বসন্ত, আসে আসে, আসে না, উঁকি ঝুঁকি দেয়, দেয় না; কোকিল ডাকে ডাকে, ডাকে না; জগত হাসে হাসে, হাসে না; তরুদল নবকিশলয়, ছাড়ে ছাড়ে, ছাড়ে না; বাসন্তিকুসুম ফোটে ফোটে, ফোটে না। এখনও শীতের আপছায়া যেন সকলেব মুখাবৃত কবিয়া রহিয়াছে।

এমতকালে ফাল্গুন মাসের প্রথমভাগে, একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে, মুক্তালতা গ্রামের রাস্তার উপরের একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলস্থ পথে চলিতে চলিতে, একটী যোগী ও একটী রমণী আলাপ করিতে কবিতে যাইতেছিল। যোগার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রমণী চলিয়াছে।

যোগী কিন্তু রমণীর দিকে একবার ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। যোগী, কহিলেন,

"এখনও গৃহে ফিরিয়া যাও।"

রমণী। আর গৃহে যা[illegible] না।

যোগী। যাবে না, কেন?

রমণী। যাবার স্থান কৈ?

যোগী। যে বাড়ীতেছিলে?

রমণী, সবিষাদে কহিল,

"সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া, আপনার সঙ্গ ধরিয়াছি।"

যোগী। আমার সঙ্গ ধরিলে, কেন? আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে?

রমণী। আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেই স্থানে যাব।

যোগী একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিলেন,

"অঁ্যা! বল কি, আমার সঙ্গে যাবে? আমি যোগী মানুষ; তোমার হ'ল এই মধুর যৌবন কাল। জান ত, এ সময়ে গৃহের বাহির হওয়া অনুচিত।"

রমণী যোগীর কথা শ্রবণ করিয়া, অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল,

"অনেক দিন হয়, এ যৌবন আপনার পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছি। এবার দয়া করিয়া, গ্রহণ করুন।"

যুবতীর নয়নাশ্রু ঝরণার ন্যায় বহিতে আরম্ভ করিল।

যোগী। ছি! ছি! ও কি কথা?

রমণী। প্রাণের কথা—স্বামী স্ত্রীর কথ।

যোগী, সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন,

"আমি তোমার কে? না জেনে না শুনে খপ্ ক'রে যে, প্রাণটি পায় দিলে?"

রমণী, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,

"তুমি আমার সর্ব্বস্ব!"

যোগী, জিভ্ কাটিয়া কহিলেন,

"সে কি। তুমি হ'লে গৃহস্থের বৌ। তোমার স্বামী রহিয়াছেন। ছি! আমাকে কেন স্বামীর ন্যায় ভাবিতেছ? এতে যে তোমার স্ত্রীধর্ম্ম নষ্ট হ'বে। পতিব্রতা রমণীর পরপুরুষকে দেখিতেও নিষেধ।"

এ কথায়, রমণীর বক্ষ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সকাতরে কহিল,

"এ পর পুরুষ, আমার পরশপাথর। আজ আমার স্বার্থক জীবন। ইহারি সংস্পর্শে, আজ আমার নারী জীবন স্বার্থক হইবে।"

যোগী ঘৃণিত স্বরে কহিলেন, "তবে তুমি কলঙ্কিনী?"

যোগী যে, এ কথাটি কহিলেন, সে কেবল যুবতীর মন পরীক্ষার্থ।

যোগীর কথা শ্রবণ করিয়া, রমণীর মস্তকে যেন বিষম বজ্রাঘাত হইল; বাক্‌শক্তি রহিত হইল; মাথা ঘুরিতে

লাগিল; চতুর্দ্দিক শূন্যময় বিলোকন করিল এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। মাথাটি, সেই পথ-নিহিত বটবৃক্ষের মূলে আহত হইল। মূলের নীচে, একটী তীক্ষ্ণ বিষধর ছিল। বেদনা পাইয়া, রমণীকে ভীষণ দংশন করিয়া, পথি পার্শ্বস্থ জঙ্গলের ভিতর লুকাইল। তীব্র বিষের জ্বালায়, রমণীর প্রাণ যায় যায় হইল; অস্ফুট ধ্বনি করিতে লাগিল। সেই অস্ফুট স্বর শুনিয়া, যোগী, রমণীর অভিমুখে ফিরিয়া চাহিলেন এবং ব্যগ্রতার সহিত কহিলেন, "এ কি, মাধুরী ?"

মাধুরী যোগীর দিকে, একবার সতৃষ্ণলোচনে চাহিল। বলিল, "না। কিছুই নহে। মাথাটি ঘুরিতেছে; তাই একটু শুইলাম।"

যোগীর কিন্তু একথাটি বিশ্বাস হইল না। তাড়াতাড়ি আসিয়া, মাধুরীর মাথাটি নিয়া নিজের হাঁটুর উপর রাখিলেন এবং এক দৃষ্টে মাধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, মাধুরীর মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে লালা বিনির্গত হইতেছে; সর্ব্ব শরীর মিহি কালো বর্ণ হইতেছে। দেখিয়া যোগী অস্থির হইলেন। কহিলেন,

"মাধুরী, প্রাণ আমার; বল এমন করিতেছ কেন ?"

মাধুরী, নীরব। কিন্তু তাহার চক্ষু দিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়িতে লাগিল এবং এক একবার যোগীর দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

এই যোগীই আমাদেব মাধুবীর স্বামী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাধুবীব স্বামী, অসৎ সংসর্গে পড়িয়া, পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি উডাইযা, দেশত্যাগী হইযাছেন। এত দিন কোথায় ছিলেন, কেহ জানিত না। আমরা সেদিন মাধুবীব স্বামীকে ছয বছব পব,' মাধুবীদেব বাডীতে যোগী-বেশে দেখিয়াছি। মাধুবীও স্বামীকে দেখিযা বেশ চিনিতে পাবিযাছিল। মাধুবীব ইচ্ছা ছিল, পুনবায় স্বামীকে নিয়া সংসাবী কবিবে। কিন্তু, যোগীর কথা শুনিযা, যোগীব অনভিপ্রায় বুঝিতে পাবিয়া, ইন্দু ও শৈলবালার কথোপকথন কালে উঠিয়া আসিযা পথেব ধাবে দাঁড়াইল। ভাবিল যে, স্বামী যদি গৃহে না থাকেন, তবে, স্বামীব সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। মাধুবীব স্বামী, সংসাব ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিযা, যোগাভ্যাস কবিতেছেন। কেবল গুকবাদেশে মাধুবীকে একবাব দেখিতে এসেছিলেন মাত্র। কাজেই, তিনি সংসাবেব উপব বীতস্পৃহ হইযা, সংসাবে থাকিতে, ইন্দু ও শৈলবালাব নিকট প্রকাবান্তরে অনভিপ্রায প্রকাশ কবিযাছিলেন। যখন যোগী, চলিয়া যাইতেছিলেন, তখনি মাধুবী তাঁহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে।

যাহাহউক, মাধুবী আসন্নকাল অতি সন্নিকট দেখিযা ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, যম তুমি এ'সেছ, বেশ ক'বেছ। এত দিনে যে তোমাব এ অভাগিনীকে মনে পড়েছে, এই যথেষ্ট। তুমি আমার প্রকৃত আত্মীয।

এই সময় আসিয়া, খুব ভাল করিয়াছ। তাই বলি, তুমি একটী মিত্রের কার্য্য করিও। কার্য্যটি আর কিছুই নহে, আমি মরিলে, এই যে আমি, আমার স্বামীর পায়ের উপর আছি, এখান হইতে অন্যত্র নিও না। যম, তোমার পায়ে ধরি, অভাগিনীর এ সামান্য অনুরোধটী রাখিও। আমি অনেক দিনের পর, এই বাঞ্জীর চরণযুগল পাইয়াছি। কিছুকালের নিমিত্ত, ওপায়ে মাথা রাখিয়া সুশীতল হইতে দিও। আমার যে বড় তাপিত পরাণ!

এ সময় মাধুরীর শ্বাস ঘনঘন বহিতে লাগিল, শরীর বরফবৎ হিম হইয়া উঠিল, চক্ষু ঘুরিতে লাগিল। যোগী, সকাতরে কহিলেন, "মাধুরী, এই কি শে——"

যোগীর যোগ ভাঙ্গিল, চোখে, যমুনা বহিল। মাধুরী স্বামীর চোখে জল দেখিয়া, কাঁদিয়া উঠিল। কণ্ঠ, রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, কেবল একদৃষ্টিতে যোগীর দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল। মাধুরী রুদ্ধকণ্ঠে ও বড় কষ্টে কহিল,

"নাথ, যাই; সময় হইয়াছে। আর থাকিতে পারিলাম না।"

মাধুরী আর বলিতে পারিল না। যোগীর দিকে চক্ষু স্থির করিয়া, যোগীর পায়ে মাথা রাখিয়া, যে নিদ্রা গেল, তাহা অনন্ত।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—৩—

বৃদ্ধেব ভাবনা।

কেন মায়া বোগ জন্মিল ? এ বিষম বোগ কি পাপে জন্মে ? এ বোগেব হাতে পডিয়া দিবানিশি কাঁদিতেছি—অনন্ত যাতনা ভুগিতেছি ! শান্তি নাই, সুখ নাই, হর্ষ নাই ; কেবলি বিষাদেব ছায়া ভীষণভাবে ঘেবিযা রহিয়াছে। তাদের কি যেন হবে, হবে, এই বুঝি হ'ল, এবাব হ'লে আব রক্ষা নাই ; পূর্ব্বে এই সব কুভাবনায কুচিন্তায়, নিযত শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন ছিলাম। তাদেব বিবাহেব পর ভাবিলাম, এখন আর কোন, জঞ্জাল রহিলনা। নির্ব্বিঘ্নে পরমার্থ সাধন করিতে পারিব।

কিন্তু, হায়! সে কুহকিনী আশাও বৃথা হইল। সংসারের বৃথা মায়ার বন্ধন ছিড়িতে পারিলাম না। রাক্ষসী মায়া আমার সেই পথে কাঁটা দিয়াছে। এখনও চিত্ত নিয়ত চঞ্চল—সেই মুখখানি দেখিবার নিমিত্ত। বিধি কেন সেই আঁখি, সেই মুখখানি দেখান না? প্রাণ যে এখনও উদ্বিগ্ন। উঃ। কি পাপে এ মায়াজালে আবদ্ধ হইলাম? মায়ার মুখটি দেখিতে পরম রমণীয় বটে, কিন্তু, পরিণাম ফল বড় শোচনীয়! আগে জানিলে, কে এ মুখ দেখিয়া, ক্লেশ ভুগিতে যাইত?

আমার তিন কাল গিয়াছে; এক কাল আছে। আজ বাদে কাল আসিয়া, যমকিঙ্কর হাতে হাতকড়া দিবে! কালের হাতকড়া বড় কঠিন। হায়! এখনও আমার ঘুম ভাঙ্গিল না? এখনও আমি ভবের গাছের মাকাল ফল দেখিয়া মজিয়া রহিয়াছি! এ ফলে আমার কি গুণ দিবে? বরং দিন দিন চরম ফলের হানি করিতেছে। হায়! হায়! আবার সেই ভাবনা মনে এলো? ইন্দু, শৈল, তোমরা কোথায়? প্রাণ যায়, তোমাদিগকে না দেখিয়া আমার প্রাণ যায়—ইহকাল পরকাল সমস্তই যায়। দুদিক গেলে আর দাঁড়াব কোথায়? ইন্দু, শৈল, তোমরা বরং আমার এক কুল রক্ষা কর! এসো মা, এসো, এ হতভাগার ভাঙ্গন কুলের দুরাবস্থা দেখিয়া যাও। আসিবে না? হাসিবে না?

কথাও কহিবে না? কেন? আমি তোমাদের কি করিয়াছি? মা, ইন্দু, আমার দোষ কি? যাইবার সময় কেন আমাকে বলিয়া গেলে না? বলিয়া গেলে, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইতাম। তোমার দুঃখে আমারও দুঃখ। শৈল, তুমি ত বুদ্ধিমতী; তুমি কেন এমন করিলে? তোমার উচিত ছিল—এই টাকপড়া মাথাটাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাওয়া। তা হলে, সর্ব্বদা তুমি টাক লইয়া রহস্য করিতে পারিতে। এখন তোমরা কোথায়? এ হতভাগা যে বৃক্ষমূলে বসিয়া, কত দুঃখ, কত কষ্ট পাইতেছে; তা কি দেখিবে না? মা হইয়া সন্তানের দুঃখ বুঝিতে পার না?

পাপ কি ভীষণ। কুহক পরিপূর্ণ—পাপের গতিবিধি। প্রতুল, তুই কেন ইন্দুর সুখের কপাল ভাঙ্গিলি? ইন্দু, তোর নিকট কি অপরাধ করিয়াছিল? ইন্দু আমার, সারল্যের পুতলি—ধার্ম্মিকের দুহিতা। সেই ধর্ম্মপ্রাণে কেন দংশন করিলি? তোর ভাল হইবে কি? ভগবান অবশ্য বিচার করিবেন। লোকের চোখে ধূলা দিলে কি হইবে? ভগবানের চোখে ধূলা দিতে পারিবে কি? হায়। আমি অভাগা কেন মহামারিতে মরিলাম না? বুঝেছি এ পাপ মরিলে, এ দুঃখ ভোগ করিত কে? প্রভু, আপনারা দেবতা, সুখে স্বর্গে গিয়াছেন। এ পাপ জীবনকে, এই শেষ কালে, এ বিষম যন্ত্রণা ভুগিতে রাখিয়া

গিয়াছেন কি? এখন একবার স্মরণ করুন! যথেষ্ট হইয়াছে—আর সহিতে পারি না! রামভদ্র, পথস্থিত একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া, এই প্রকার ভাবিতেছিল।

যে দিন ইন্দুমতী ও শৈলবালা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যায়, রামভদ্রও সেইদিন ইন্দুমতী ও শৈলবালার অন্বেষণার্থ বাহির হইয়াছে। রামভদ্র, অনেক গ্রাম, অনেক দেশ ঘুরিয়াছে; কিন্তু, কোথায় ইন্দুমতীকে পাইতেছে না। না পাইয়া, হতাশ হইয়াছে। তাই, বৃক্ষমূলে বসিয়া, মনের ব্যথায় অনুতাপ করিতেছিল।



ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

নদীবক্ষে।

সপ্তমীব চাঁদ উঠিযাছে। জগত যেন হর্ষে ডগমগ করিয়া হাসিতেছে। নদী, বজত মেখলা পবিধান কবিযাছে। স্নিগ্ধ অনিলে, নদী-বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিল্লোল তুলিযাছে। বীচিমালাতে চন্দ্র-কিবণ নিপতিত হওয়ায় চিক্ মিক্ করিতেছে। পুলকে নদীব যেন বোমাঞ্চ হইতেছে।

নদী সৈকতে একখানা পানসী তরণী বাঁধা বহিযাছে। নৌকা বাঁধিয়া, মাঝি ও মাল্লাগণ, সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনানুসাবে ডাঙ্গায় উঠিয়াছে। তবণীতে দুটি আরোহী, যুবক ও যুবতী। যুবক, মাঝিদেব প্রত্যাবর্ত্তনে দেবী দেখিয়া, নৌকার ছাদের বাহিবে আসিল। দেখিল, বড় পরিষ্কাব রজনী। জগতেব গায় যেন আনন্দ ধরিতেছে না। নদীর জল তির্ তির্ তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত

হইতেছে। দেখিয়া যুবকের অন্তঃকরণে হর্ষের জোয়ার ছুটিল। ধীরে ধীরে তরণী খুলিয়া দিল, যুবক নৌকা বাহিতে সুপটু; হাইল বাহিয়া নৌকা খানা নদীবক্ষে নিয়া চলিল। তরণী, মৃদু মন্দ অনিলান্দোলিত উচ্ছ্বাসে সুন্দর নাচিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ নদী বক্ষে যাইয়া, হাইল ছাড়িয়া দিল এবং ছাদে গিয়া বসিল। তরণীখানা, স্রোতাভিমুখে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। যুবক, একবার নীচে গেল। পানসীর ভিতরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ গুলি উন্মুক্ত ছিল। চন্দ্রের কিরণ গবাক্ষের ভিতর দিয়া আসিয়া, একখানি মুখের উপর পড়িয়াছে—অবগুণ্ঠনের আধখানি, মুখ হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল। সপ্তমীর চাঁদের কি তাই এত আনন্দ,—এত উল্লাস? সখীকে জাগাইবার জন্য কত কাকুতি, কত মিনতি করিল—কিছুতেই ত সখী জাগিল না। চাঁদ, একবার সখীর এলায়িত কুন্তল গুচ্ছ ধরিয়া টানিল, আবার কাণের ভিতর দিয়া প্রাণে পৌছিল—ডাকিল। সখী তো জাগিল না—সখী যে নিস্পন্দ। চাঁদ, সখীর নিকট পরাজিত হইল।

যুবক নীচে আসিয়া, চাঁদের ব্যবহার দেখিল এবং একদৃষ্টে সকুন্তল মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিল। ছাদে যাইতে ভুলিয়া গেল। যুবকের যেন কি মনে হইল; ধীরে ধীরে বাক্স খুলিয়া, একটী বাঁশী বাহির করিল এবং বাঁশী নিয়া ছাদে উঠিল। ছাদে উঠিয়া, ভাবিতে

আরম্ভ করিল। ভাবিল, সেই যমুনা, সেই বাঁশী, সেই আবার যমুনার উজান! সত্য সত্যই কি বাঁশীতে যমুনা উজান বহিত? কেন বহিত? বাঁশীর এমন কি গুণ ছিল যে, যমুনা ফিরিয়া চাহিত? গুণ থাকিলেই গুণীর আদর, নির্গুণের আদর কোথায়? বুঝেছি, বাঁশীর গুণ ছিল বলিয়াই, যমুনা উজান বহিত!

এই ভাবিয়া, যুবক, বাঁশীতে চুম্বন করিল। বাঁশী আদরে গদ্ গদ্ হইয়া উঠিল। খাম্বাজের সহিত ঝিঁঝিটের বিবাহ দিয়া, পিলুতে হুলুধ্বনি দিল; পুরবী পুরোহিত, ধীরে ধীরে মন্ত্রপাঠ করিয়া বিদায় হইলেন; ইমনকল্যাণ আসিয়া, নব দম্পতীকে গজলের গঙ্গাজল সিঞ্চন করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিল, জয়জয়ন্তী আসিয়া জয়ধ্বনী করিল; লুমের মিহিদানায়, কানেড়ার কোপ্তা, কালেংড়ার কালিয়া, ভূপালীর পোলাউ প্রস্তুত হইতে লাগিল; পরজবাহারের চাট্নির বন্দোবস্ত হইল; বাগেশ্রী—পাহাড়ী—সাহানা পরিবেশনে নিযুক্তা হইল; নিশীথে বরযাত্রীর দল—বেহাগ, শঙ্কর, মেঘ মহাশয়রা ভোজনে বসিলেন। এ মহাভোজনের সময়, হঠাৎ শৈলবালা আসিয়া, যুবকের নিকট উপনীত হইল। পরে, কহিল,

"ছি! ছি! তুমি বড় বেযাদপ্; আমার ঘুম ভাঙ্গিলে কেন?"

যুবক। শান্তি ভঙ্গের অপরাধ করিয়াছি; দণ্ড দাও।

যুবক, তারাকান্ত।

শৈলবালা, তারাকান্তের হাত হইতে বাঁশীটি কাড়িয়া লইল। পরে, কহিল,

"এই দেখ, তোমাকে মণিহারা ফণি করিলাম।"

তারাকান্ত হাসিল। বলিল,

"পরশমণি আজ আমার বাঁশী ছুঁইয়াছে। বাঁশের বাঁশী সোণার বাঁশী হইল।"

শৈল। একবার সোণাটা পরীক্ষা করিয়া দেখি? তোমার কাছে কষ্টি পাথর আছে?

তারাকান্ত, শৈলবালার হাত হইতে বাশীটী পুনঃ গ্রহণ করিল এবং দুই তিনবার অধরের সম্মুখে ধরিল; কিন্তু বাঁশীতে আর তেমন স্বর তরঙ্গ উঠিল না। শৈলবালা তখন সহাস্যে কহিল,

"ছি! ছি! নাগর হা'রলে?"

বাঁশী ছাড়িয়া, তারাকান্ত তখন শৈলবালার সহিত একটু কৌতুক করিতে আরম্ভ করিল। শৈলবালাকে জলে নিক্ষেপ করিবার ছলে, শৈলবালার ভুজযুগল ধরিয়া, ধাক্কা মারিল; আবার অমনি টানিয়া ধরিল। শৈলবালাও তারাকান্তকে জড়াইয়া ধরিল। কাজেই শৈল, জলে পড়িল না।

তখন তারাকান্ত দেখিল, তরণীখানা স্রোতের বেগে, অনেক দূর সরিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি হাইল বাহিয়া,

কূলের অভিমুখে চলিল। কিন্তু, প্রবল-স্রোত বেগ বশত পারের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। ইহা দেখিয়া, শৈলবালা হাসিতে হাসিতে কহিল,

"আমি দাঁড় টানিব কি, মাঝি মহাশয়?"

তারাকান্তও শৈলবালার কথা শুনিয়া হাসিল। বলিল,

"মাল্লারাণী। দাঁড় টানিতে হ'বে না। শুধু পালটা টেনে দিলেই হয়। পারিবে?"

নৌকার মাস্তুল উঠান ছিল। একখানি পালও তোলা ছিল। কিন্তু, পালখানা মাস্তুলে জড়াইয়া রহিয়াছে। তা দেখিয়া, শৈলবালা কহিল,

"ভয় নেই; বাহিতে না জানিলে মাঝিগিরি ক'রে কায কি?"

শৈলবালা মাঝিদিগকে পাল তুলিতে দেখিয়াছিল। কাজেই, পাল টানিয়া দিতে, শৈলবালার কিছুমাত্র ভাবিতে কি ক্লেশ পাইতে হইল না। অনায়াসে পাল টানিয়া দিল। তরণীখানা তখন অনুকূল বায়ুবেগে, হু হু করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তারাকান্ত, তরণী বেগে চলিতে দেখিয়া কহিল,

"আমার এরূপ একটী ভাল মাল্লা রাখিতে হইবে যে, প্রতিকূল বায়ু, কি ঝড়তুফানে পড়িলেও যেন কোন ক্লেশ না হয়।"

শৈলবালা সহর্ষে কহিল,

"এমন নির্গুণ মাঝির কাছে, ভাল মাল্লা আসিবে কেন? আমি যে এসেছি সে কেবল প্রাণের বোঝা বহিতে পারিনা বলিয়া।"

তারাকান্ত হাসিল। কহিল,

"বেশী মাহিনা দিলে ঢের ঢের আসিবে। তোমার প্রাণের বোঝা কি এতই ভারি যে, মাল্লাগিরি ক'রে প্রাণ বেঁচিতে এসেছ।"

শৈলবালা। ভারী বলেই ত এসেছি। অন্যে শুধু মাহিনার জন্য আসিবে না?

তারাকান্ত। কেন, আসিবে না?

শৈলবালা রহস্য করিয়া কহিল,

"নির্গুণ মাঝির সঙ্গে থাকিয়া, কে প্রাণ দিতে যাবে? প্রাণের ভয় সকলেরই আছে। বিশেষত তুমি ঝড় তুফানে ভাড়া নিবে না; তাতে পোষাবে কেন?"

তারাকান্ত সকৌতুকে কহিল,

"প্রাণের ভয় কেবল আমাদের শৈলবালার নেই!"

মুহূর্ত্তের ভিতরে তরণী স্বস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। তারাকান্ত ও শৈলবালার কথা মাঝখানে শেষ হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দুই জন।

হাঁসিকান্না গ্রামের বহির্ভাগে একটী সুবৃহৎ নিবিড় জঙ্গল। সেই নিভৃত জঙ্গলের ভিতর আবার একটী প্রকাণ্ড অত্যুচ্চ বৃক্ষ। বৃক্ষটি ঘন ঘন শাখা প্রশাখায় ও পল্লবে সমাচ্ছাদিত। পাতার আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিবার বিশেষ সুবিধা। কাকপ্রাণীও জানিবার উপায় নাই—এত নিবিড়। বৃক্ষের নীচে, মৃত গো মেষাদির কঙ্কালে, ছেঁড়া জুতায়, ভাঙ্গা ঝাঁটায় গ্রথিত মালা গলে পরিহিতা একটী বিকটাকার রমণী-মূর্ত্তি বিরাজিতা। রমণীর মুণ্ডিত মস্তক বাহিয়া, দরবিগলিত ধারায় ঘোল পড়িতেছিল। স্ত্রীলোকটি বৃক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া গল-দেশজাত কঙ্কালাদি উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কঠিন বন্ধন, খুলিতে পারিল না। কিন্তু, উন্মোচনকালে কঙ্কালের ঝন্ ঝন্ শব্দ সমুত্থিত হইল।

সেই শব্দ বৃক্ষের পাতায় পাতায় সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রতিধ্বনি করিল। সঙ্গে সঙ্গে মানব কণ্ঠেও উচ্চারিত হইল,—

আওলো আমার পেত্নী কাঁচা সোণা,
ডালে ডালে ঘুরবি খাবি পাকা নোনা।
হাড় ঠন ঠন্, ঝাটার ঝন্ ঝন।
কেমন বুঝিস্ পেত্নী লো এখন ?

এই ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিবামাত্র, স্ত্রীলোকটি ঊর্দ্ধদিকে চাহিল। দেখিল, একটী লোক পা ঝুলাইয়া ডালে বসিয়া আছে এবং ঈর্ষা-বিস্ফারিত চোখে কটাক্ষ করিতেছে। রমণীর চোখ, লোকটির চোখে চোখে পড়িবামাত্র, লোকটি বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত করিল। হেঁচ্‌কাটানে একটা পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া, পাতাটি ফেলিতে ফেলিতে, বিজাতীয় বিকটস্বরে কহিল,

পেত্নীর গায় কালি, মুখে চুন।
বল দেখি লাগে কেমন কেমন ?

রমণী, স্বর চিনিল—ডাকিল। লোকটি কিন্তু উত্তরও করিল না। কেবল পাতার অন্তরালে থাকিয়া, সজোরে শাখাগুলিকে ঘন ঘন আন্দোলন করিতে লাগিল। আন্দোলন করিতে করিতে, বিষম কর্কশকণ্ঠে কহিল,

আওলো আমার পেত্নী কাঁচা সোণা,
ডালে ডালে ঘুর্‌বি খাবি পাকা নোনা।
হাড ঠন ঠন্ ঝাটার ঝন্ ঝন্।
কেমন বুঝিস্ পেত্নী লো এখন ?
পেত্নীর গায় কালি, মুখে চুন।
বল দেখি লাগে কেমন কেমন ?

স্ত্রীলোকটি, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এ বিদ্রূপজনক বাক্য সহ্য করিল। পরে, কহিল,

"প্রতুল, আর ব্যঙ্গ করিও না। তোমার এ ব্যঙ্গ, এ সময়ে, আমার অসহ্য।"

স্ত্রীলোকটি আমাদের গৌরমণি। গৌরমণি, রায়দের কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, তৎকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, বিশিষ্টরূপে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও অপমানিত হইয়াছিল। রায়রাই তাহার গলদেশে কঙ্কালাদির মালা প্রদানপূর্ব্বক গ্রামের বাহির করিয়া দিয়াছিল। গৌরমণিকে দেখিলেই, লোকে টিট্‌কারী, হাততালি ও বিদ্রূপ করিত। এ সব টিট্‌কারী সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রাণের ভয়ে, এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। সে জানিত না যে, প্রতুল আবার এ বনের ভিতর লুক্কায়িতভাবে রহিয়াছে। গৌরমণি, প্রতুলকে

গোপনে গোপনে অনেক খুঁজিয়াছিল। আর এ জনমে দেখা হইবে না বলিয়া, নিবাশও হইয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল; প্রতুলেব সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাকে সঙ্গে কবিয়া চিবজীবনেব নিমিত্ত হাসিকান্না গ্রাম পবিত্যাগ পূর্ব্বক, ভিন্নদেশে যাইয়া থাকিবে। কিন্তু দৈবাধীন যদিও জঙ্গলে সাক্ষাৎ হইল, তথাপি গৌরমণির আশা পূর্ণ হইল না। প্রতুলকুমার, গৌরমণিব কথা শুনিযা বাগান্বিত হইল। রাগতস্বরে কহিল,

"পাপিয়সি, এখান হ'তে দূর হ'——"

প্রতুলও বায়দের উৎপীডন ভয়ে, প্রচ্ছন্নভাবে, এ বৃক্ষে অবস্থান কবিতেছিল। প্রতুল, গৌবমণিব লাঞ্ছনা-প্রাপ্ত অবযব ঈক্ষণ কবিযা বিস্মিত হইল। ভাবিল, গৌবমণি বুঝি তাহাকেও ধবাইযা দিতে আসিয়াছে। বায়েদেব লোকও তাহাব সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে আছে। প্রতুল ভুল বুঝিল। গৌবমণির উদ্দেশ্য তাহা নহে।

এ কথায়, গৌবমণিব হৃদয়ে আগুণ জ্বলিল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নেত্রে বলিল,

"প্রতুল, আমি পাপিয়সী সত্য, কিন্তু, তোমার ন্যায অকৃতজ্ঞ পাপাত্মা নহি।"

প্রতুলেব রাগ দ্বিগুণ বাডিল। প্রজ্বলিত হুতাশনেব ন্যায় প্রদীপিত হইয়া উঠিল। কহিল,

"মাগীর অদৃষ্টে আজ কিছু আছে!"

প্রতুল ক্রোধে আর কিছু বলিতে পারিল না।

গৌরমণিও ক্রুদ্ধা সাপিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বলিল,

"পাষণ্ড, আমার অদৃষ্টে, না তোর অদৃষ্টে?"

প্রতুল তখন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া, গৌরমণির গাত্রে একটী ডাল ভাঙ্গিয়া, প্রবলবেগে ছুড়িয়া মারিল। গৌরমণি আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা জাগিয়া উঠিল। দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ করিল। দন্ত কড়্ মড়্ করিয়া উঠিল। পরে, সক্রোধে বলিল,

"পাষণ্ড, সাবধান! নিতান্তই তোর মরণ কাল উপস্থিত।"

এই বলিয়া, কট্মট্ করিয়া প্রতুলের পানে তাকাইল।

প্রতুল মুখভঙ্গি করিয়া, ব্যঙ্গস্বরে কহিল,

"সত্যি, পেত্নী, কালমুখী, সত্যি?"

যেমন এই কথা বলিয়াছে, অমনি বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া, ডালসহ প্রতুল ভূমিতলে পড়িয়া গেল। গৌরমণি, তৎক্ষণাৎ প্রতুলের সম্মুখে আসিল। দেখিল, একটী শাখা, প্রতুলের বক্ষ ভেদ করিয়া, পৃষ্ঠদেশ দিয়া নির্গত হইয়াছে, পাজর পেটের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছে, হাত পা ভাঙ্গিয়া হাড় বাহির হইয়াছে, শাখা লাগিয়া একটী চোখের তারকা খুলিয়া গিয়াছে, বিদীর্ণ স্থান দিয়া

ঝলকে ঝলকে শোণিতস্রাব হইতেছে। প্রাণ যায় যায়, ওষ্ঠাগত!

তখন গৌরমণি, বিকট হাসিয়া উঠিল। গৌরমণির চোখে আগুন জ্বলিতে লাগিল। সজোরে প্রতুলের বক্ষে পদাঘাত করিল। পরে বিকৃত-কর্কশ-কণ্ঠে কহিল,

"দেখ পাষণ্ড, গৌরমণির প্রতিজ্ঞা রক্ষা!"

এই বলিয়া, উপর্য্যুপরি প্রতুলের বক্ষে পদাঘাত করিতে লাগিল। রাক্ষসী গৌরমণি! এ ভাবে কি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হয়?

প্রতুল মুমূর্ষাবস্থায় ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,

"আমি মহাপাপী—আমার পাপের উপযুক্ত ফল হইল।"

বলিতে বলিতে প্রতুলের প্রাণবায়ু, পাপদেহ পরিত্যাগ করিয়া গেল। রাক্ষসী গৌরমণিও তখন হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।



পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

ভবিষ্যৎ বাণী।

এ কি খেলা? জলে, জল বুদ্‌বুদ্; স্থলে, ফুলেব হাসি। এই উঠে, এই নিবিয়া যায়; এই হাসে, এই ঝরিয়া পড়ে। অদ্ভুত বহস্য। এ বহস্য কে বুঝিতে পাবে? যে বুঝিতে পাবে, সে কেন এ লীলাময় ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে অনিচ্ছুক? বুঝেছি, এ খেলায় অনন্ত যাতনা। যাতনা সকলে সহিতে পারে না। কাজেই, সকলে এ খেলা খেলিতেও চায় না। এ সমস্ত কি ভাবিতেছি? আপনাব কথা না ভাবিয়া, কি করিতেছি? যা'ক্ আমাব কথাই ভাবি।

কোথায় এসেছি? কি হইয়া গিয়াছিলাম? উন্মত্ত! সেই অবস্থায় কিন্তু ছিলাম বেশ। এ সংসাবেব সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, ভাল মন্দ জ্ঞান ছিল না; মানব জীবনেব

কোন অভাবই বুঝিতে পারিতাম না; ইহলোকে যেন আমার কোন সম্পর্কই ছিল না, কেমন একটানা যমুনার স্রোত জলের ন্যায় জীবন চলিতেছিল। সে জীবন আর এখনকার জীবন কত যে বিভিন্ন, বলিতে পারি না। ইহ জগতে তার তুলনা হয় না: সেই পরোপকারী মহাত্মা বলিযাছেন "উন্মত্তাবস্থায় জলে নাকি ডুবিয়াছিলাম, তিনি প্রাণ দিয়াছেন।" ডুবিয়াছিলাম ত আবার উঠিলাম কেন। উঠিলাম ত যাহাকে চাই, তাহাকে পাই না কেন? এ উঠায় ফল হইল কি? তাঁহার প্রসাদে উন্মত্ততা দূরীকৃত হইযাছে, জীবন পাইয়াছি। জীবন পাইয়াছি সত্য; কিন্তু জীবনে সুখ শান্তি নাই। কেবল শোকানলের পুনরুদ্দীপ্তি। এখনকার অনল যেন পূর্ব্বাপেক্ষা প্রখর অসহ্য। ইন্দুমতীর সংশ্রবে যতদিন ছিলাম ততদিন শোক তাপ কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ইন্দু, আমার হৃদয়ে বাম রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। এখন আমার সেই বাম রাজ্যে রাষ্ট্র বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বদা হাহাকার, আর্ত্তনাদ, অশান্তির অবিরাম অনন্ত হিল্লোল বহিতেছে। আর দেখ, সেই আকাশ, সেই শুভ্র জ্যোৎস্না কিরণ পরিমিশ্রিত চাঁদের থল থল্ হাসি, সেই কাল কোকিলের কোমল কণ্ঠের কহু কহু ধ্বনি, আর সেই যমুনার সুস্নিগ্ধ প্রাণ মাতান কুল কুল রাগিণী, সকলি সমভাবে রহিয়াছে। কিন্তু, আমার কিছুই নাই। এ সংসারে যাহার কিছু নাই;

তাহার হৃদয়ে যে কত অনল; কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? একের অভাবেই এ জীবন বিষাদময় হইয়া রহিয়াছে। জানি, আমার সুখের সাগর সুশীতল জলে পরিপূর্ণ। আমি পিপাসায় ওষ্ঠাগত! আকণ্ঠ পূরিয়া জল খাইবার নিমিত্ত বারি স্পর্শ করিতে যাই, কিন্তু স্পর্শ করিতে পারি না। দেখি, সাগর বক্ষ যেন সাহারার মরুভূমি। ত্রাসে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যখন জল থাকিতেও, জলপান করিতে পারি না, তখন আর আমার জীবন-দানে ফল হইল কি? কষ্ট দেওয়াই কি ইচ্ছা? আর যে ক্লেশ সহিতে পারি না। প্রাণে যে বড় ব্যথা পাই! আমায় কষ্ট দিয়া লাভ কি? আমি কি কাহার ক্ষতি করিয়াছি? একটী মাটীর উচ্চ ঢিপির উপর বসিয়া আমাদের নরেন্দ্রনাথ, এইপ্রকার ভাবিতেছিল।

উন্মত্তাবস্থায়, নরেন্দ্রনাথ, একদিন নদীর কূল দিয়া যাইতেছিল। সহসা কূল ভাঙ্গিয়া নদীতে পড়িয়া যায়। সেই সময় একটী পরোপকারী সন্ন্যাসী নদীতে স্নান করিতে ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে নদীতে পতিত হইতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ নদী হইতে নরেন্দ্রকে উত্তোলন করেন। নরেন্দ্র-নাথ, সন্ন্যাসী ঠাকুরের অতি সন্নিকটেই পতিত হইয়াছিল। নরেন্দ্রকে উত্তোলন করিয়া দেখিলেন যে, নরেন্দ্রনাথের ঘোর উন্মত্তাবস্থা। তখন সন্ন্যাসী নরেন্দ্রকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। পরে, কিছুদিন রাখিয়া, উন্মত্ততা ভাল

করিয়া দেন। নরেন্দ্রনাথ, উৎকৃষ্টরূপ ভাল হইয়া, ইন্দুকে যে বিনা দোষে, প্রতুল ও গৌরমণির কুচক্রান্তে পড়িয়া, পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ইন্দুমতীর অন্বেষণার্থ ক্লেশ, অনিদ্রা, অনাহার ও চিন্তা ভাবনায়ই যে উন্মত্ত হইয়াছিল, এ সমস্ত বিষয় একে একে সন্ন্যাসীর নিকট অকপটে বিবৃত করিল। শুনিয়া সন্ন্যাসী নরেন্দ্রের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া, ইন্দুমতীর অন্বেষণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু, নিজের সুখের নিমিত্ত, মহাপুরুষকে ক্লেশ দেওয়া অসঙ্গত বোধে, নরেন্দ্র তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া, নিজেই ইন্দুমতীর অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছে। অন্বেষণ করিতে করিতে, পরিশ্রান্ত হইয়াই উচ্চ মাটির ঢিপির উপর বসিয়া ভাবিতেছিল।

যাহাহউক, নরেন্দ্রনাথ, কিছুক্ষণ এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, সেইস্থান হইতে উঠিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে চলিল। দুইদণ্ডকাল বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই যেন ইন্দুমতীকে পাওয়া যাইবে, এই প্রবল আশায়, আগ্রহের সহিত হাঁটিতেছে। পথশ্রমেও ক্লান্তি উপবোধ করিতেছে না। একটুকু আর একটুকু—ঐ যে দূরে গ্রামখানি ধূ ধূ ধূ ধূ দেখা যাইতেছে; আর ঐ যে প্রান্ত শূন্য প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ ধূ ধূ করিতেছে, উহা পার হইতে পারিলেই যেন ইন্দুমতীকে পাইতে পারিবে, বক্ষে রাখিয়া, এ পথশ্রম দূর

করিবে, চিরদিনের মত সুখের মুখ দেখিবে। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে পথ অতিক্রম করিতেছে এবং কত বিস্তীর্ণ মাঠ, কত বিস্তীর্ণ গ্রাম অবহেলায় লঙ্ঘন করিয়া আসিযাছে। সংখ্যা নাই। বহুদূরে—ঐ যে একটী বৃক্ষ ধূ ধূ ধূ ধূ দেখা যাইতেছে, সেই বৃক্ষটী দেখিয়া ভাবিতেছে—ঐ বৃক্ষের অন্তরালেই বুঝি ইন্দুমতী তাহাকে দেখিযা প্রচ্ছন্নভাবে রহিযাছে। নরেন্দ্র এইরূপ ভাবিতেছে, আর বৃক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। আস্তে-আস্তে, ধীরে, অতি সন্তর্পণে পা ফেলিতেছে। ভয—পাছে কোন প্রকার সাড়া শব্দ পাইযা, ইন্দুমতী পলাইযা যায। কিন্তু, হায় বৃক্ষের সন্নিধানে আসিযা, ইন্দুকে দেখিতে পাইতেছে না। দেখিতে না পাইয়া নিরাশায ভগ্নোৎসাহ হইতেছে এবং ভগ্ন-হৃদযে চারিদিকে উদাস্ উদাস্ দৃষ্টিপাত করিতেছে। কখনও নরেন্দ্রর চোখের জল কপোল বাহিয়া অবিরল পড়িতেছে; কখনও অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে, দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছে, আর হাঁটিতেছে।

নরেন্দ্রনাথ এখন প্রান্তর, মাঠ ও গ্রাম ছাড়িয়া, নদীর কূলে আসিল এবং নদীর কূলে কূলে চলিতে আরম্ভ করিল। নদীর কূল ভাঙ্গিযা পড়িতেছে; কূলের গাছ গাছড়া, বাড়ীঘর হুড়্ হুড়্ ঝুড়্ ঝুড়্ করিযা ভাঙ্গিতেছে—পড়িতেছে। অকস্মাৎ নরেন্দ্রর পশ্চাৎভাগে মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল। কে যেন বলিল, "নরেন্দ্র, কি দেখিতে চাও?"

নরেন্দ্র মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশ্ব সংসার খুঁজিল। খুঁজিয়া দেখিবার উপযুক্ত জিনিষ পাইল না। অবশেষে হৃদয় খুঁজিল, খুঁজিয়া পাইল, ইন্দুমতীর মূরতি। অমনি বলিয়া উঠিল,

"ইন্দুমতীকে।"

সেই কণ্ঠে কহিল,

"ইন্দুমতীর চরিত্রের প্রতি তোমার বিশ্বাস আছে?"

নরেন্দ্র অম্লান বদনে কহিল,

"খুব দৃঢ় বিশ্বাস আছে।"

আবার সেই কণ্ঠ, গভীর স্বরে কহিল,

"সাবধান! এখনও বলি, আবার মনের সঙ্গে বুঝিয়া দেখ। তুমি—"

নরেন্দ্র বিরক্ত হইল। কথায় বাধা দিয়া, ব্যগ্রভাব সহিত কহিল,

"মনের সঙ্গে মিলাব কি ছাই ভস্ম! বলুন, ইন্দু কোথায় আছে?"

অন্তরীক্ষ হইতে সেই কণ্ঠ হাসিল। কহিল,

"তুমি পাগল, এত ব্যগ্র হইলে চলিবে কেন?"

নরেন্দ্র রাগিল। অতি বড় কর্কশ-স্বরে কহিল,

"তুমি মানুষই হও, আর দেবতাই হও, তোমার ন্যায় কাপুরুষ আর এ জগতে নাই। তুমি গোপনে থাকিয়া আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছ; সম্মুখে পাইলে তোমার

মাথার খুলি ভাঙ্গিতাম। দেখিতে, নরেন্দ্রব বাহুতে কত বল ধবে !”

অন্তবীক্ষ হইতে পুনরায় প্রশান্তস্ববে কহিল,

“বৎস নবেন! যাহাব হৃদয়ে সহিষ্ণুতা নাই, সে কি মানুষ ?”

নবেন্দ্রব মোহ ভাঙ্গিল। বোধ হইল, যেন এ স্বব কোথাও শুনিযাছে। অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু চিন্তা কবিতে কবিতে কিছুই নির্ণয কবিতে পাবিল না। অনুমান কবিতে না পাবিযা, কাতব ভাবে কহিল,

“আমি নবাধম, আমাব অপবাধ ক্ষমা করুন। আপনাব পায়ে পডিতেছি, অনুগ্রহ কবিযা আমাকে ইন্দুমতীব সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবাব উপায বলিযা দিন্। নচেৎ এখনি নদী-জলে এ দগ্ধ প্রাণ বিসর্জ্জন কবিব।”

“প্রতিজ্ঞা কবিতে পাবিবে ?”

“পাবিব।”

“প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিবে না ?”

“কখনও না, এ প্রাণ থাকিতেও না।”

“কখনও আব ইন্দুকে পবিত্যাগ কবিবে না ?”

“না।”

তখন অন্তবীক্ষ হইতে ধীবে ধীবে বলিতে আবন্ত কবিল। বলিল,

"বৎস নরেন্দ্র! অনতিদূরে কন্‌কন্ গ্রামে একটী ভগ্নপ্রসাদ আছে। সেখানে গেলেই ইন্দুমতীর দেখা পাইবে। ইন্দুর পবিত্র হৃদয়, অযত্ন করিও না।"

স্বর থামিল। নরেন্দ্র দেখিল, কথাগুলি বলিয়া, তাহার সম্মুখ হইতে যেন একটী বিরাট মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। নরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যিনি নরেন্দ্রনাথের সহিত অন্তরীক্ষ হইতে, উল্লিখিত কথা গুলি বলিলেন, তাহার কথা আমারা পরে বলিব।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

মৃত্যু শয্যায়।

সামান্ত একখানা বাড়ী। বাড়ীতে মাত্র একখানা ঘর। ঘরখানার সমস্তই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। চালে খড় নাই, বেড়ায় আবরণ নাই—খুলিয়া পড়িতেছে, দরজায় কপাট নাই। ঘরের কোণে, যেখানে সেখানে ঝুল পড়িয়াছে। ঘরের ভিতর বিশৃঙ্খলভাবে খানকতক তৈজসপত্র রহিয়াছে। সেগুলি আবার ভাঙ্গা চুরা। কোন খানায় দাগ ধরিয়াছে, কোন খানায় ময়লা পড়িয়াছে, কোন খানার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোন খানা বা অপরিষ্কারে একশেষ হইয়া রহিয়াছে। বাড়ীময় ভয়ানক দুর্গন্ধ। নরক হইতেও

যেন বেশী। ঘবের ভিতর ততোধিক। সেই নরক তুল্য ঘবটাব ভিতর ছিন্ন ভিন্ন কাঁথার বিছানায়, একটী বমণী পড়িয়া আছে।

রমণীর ভীষণ আকৃতি। শরীরের সমস্ত হাড় বাহির হইয়াছে; সারি সারি শিব উঠিয়াছে; বর্ণ পাণ্ডুসে হইয়া গিয়াছে; গাল ভাঙ্গিয়া, হাড় উঠিয়া, মুখের আকৃতি ভীষণ হইয়াছে; চক্ষু কোটবে বসিয়া গিয়াছে; কিন্তু মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সে চোখে, অবিশ্রান্ত জল পড়িতেছে, মাঝে মাঝে উদাস্ দৃষ্টিপাত কবিতেছে; ক্ষীণ কণ্ঠ। রমণীব প্রাণ যায যায়। ক্ষণে ঈষৎ জ্ঞানেব বিকাশ, ক্ষণে তন্দ্রা। জ্ঞানাবস্থায় পাশ ফিবাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পাবিতেছে না। এমন যন্ত্রণা হইয়াছে যে, নড়িতে চডিতেও যেন প্রাণ যায় যায়। তন্দ্রাবস্থায বমণী দেখিল, সে যেন উত্তাল-তবঙ্গান্দোলিত কালসাগবে পড়িযাছে। কিন্তু, আশ্রয় পাইতেছে না। গভীব কালসাগব, নাই কূল, নাই কিনারা—অকূল সাগব। আশ্রয় কেথায পাইবে? সাগবের উত্তাল-তবঙ্গমালা মাথার উপব দিয়া গড়াইয়া গড়াইযা যাইতেছে। বমণীর নাসাবন্ধ্রে, মুখে, চোখে, কর্ণ কুহবে, হু হু কবিযা যেন সেই জল প্রবেশ কবিতেছে। প্রচুর জল খাইতে খাইতে পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে, সাগবে পডিয়া হাবু ডুবু থাইতেছে; এক নিশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতে না ছাডিতেই তরঙ্গেব পব

তরঙ্গ, ক্রমান্বয়ে আসিতেছে—যাইতেছে। বিশ্রাম নাই—অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। রমণী মাঝে মাঝে টেনে টেনে, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, অনেক কষ্টে, দুই একবার নিশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতেছে; তরঙ্গের আবর্ত্তে আবর্ত্তে ডুবিতেছে—উঠিতেছে, আবার ডুবিতেছে—আবার উঠিতেছে। যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছে।

সহসা রমণী আবার দেখিল, সেই উত্তাল তরঙ্গের ভিতর একখানা ক্ষুদ্র তরণী—সুন্দর ভাসিতেছে। এত যে তরঙ্গ তবুও তরণীখানা স্থির—নিশ্চল। সেই তরণীতে আবার কতকগুলি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তিগুলির প্রত্যেকের হস্তে, এক একটা বংশ খণ্ড। সেই বিকটাকার মূর্ত্তিগুলি, হস্তস্থিত বংশখণ্ড দিয়া, তরণী বাহিয়া বাহিয়া রমণীর সম্মুখে আসিল। আসিয়াই একখণ্ড বংশ রমণীর অতি নিকটে ফেলিয়া দিল। রমণী, সেই বংশখণ্ড ধরিবার নিমিত্ত, হাত তুলিল। বংশখণ্ড ধরে ধরে, এমন সময় একটী মূর্ত্তি হি হি করিয়া হাসিয়া, বংশখণ্ড তুলিয়া লইল। রমণী, আশ্রয় বিহীনা হইয়া, উপর্য্যুপরি হাবু ডুবু খাইতে লাগিল। হাবু ডুবু খাইতে খাইতে, রমণী অনুমান করিল—তাহার প্রাণ যেন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতই যেন সে মরিয়া গিয়াছে। মরিয়া গিয়াছে তবুও তার শান্তি নাই। তবুও সে দেখিতেছে তাহার মৃত দেহটা জলে ফুলিয়া গিয়াছে, সেই স্ফীত বিশ্রী দেহটা

ভাসিতে ভাসিতে তীরে সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কতকগুলি কুকুর, শৃগাল, শকুনি ও কাক যেন দেহটাকে টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িতেছে—ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। রমণী, এসব দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে; ত্রাহিমাং, ত্রাহিমাং রবে উচ্চধ্বনি করিতেছে; কিন্তু কেহই সেই রব শুনিতেছে না। অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে।

রমণী আরও দেখিল, কিয়ৎকালপর, সেই বিকটাকার লোকগুলি, স্কন্ধে করিয়া যেন তাহার প্রেতাত্মাকে লইয়া চলিল। কোথায়? ক্রমশ অন্ধকারে। যত অগ্রসর হয়, ততই যেন ঘন, অতিঘন অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিতেছে। সেই আঁধার ভেদ করিয়া, কিছুই দেখা যায় না। এত ঘন অন্ধকার যে, লোক প্রাণীও থাকিতে পারে না। অন্ধকারের উপর অন্ধকার। গাঢ়, গভীর ভীম অন্ধকার। অন্ধকারে যেন দিগন্ত ব্যাপিয়া আছে। বামে, দক্ষিণে, উচ্চে, নীচে, সম্মুখে, পশ্চাতে অন্ধকার ছুটিতেছে—ভ্রূকুটি করিয়া নাচিতেছে—প্রবাহিত হইতেছে। সহসা সেই নিবিড়, ভীম, দুর্জ্জয়, ভীষণ অন্ধকারের ভিতর একটুকু বিদ্যুৎ চমকিল। রমণী, তাহাতেই পুনরায় দেখিল, সম্মুখে অনলোপরি তৈলপূর্ণ প্রকাণ্ড লৌহ কটাহ। টক্‌বক্ করিয়া তৈলগুলি ফুটিতেছে, ওতঃপ্রোতভাবে ক্রীড়া করিতেছে। সেই প্রচণ্ড উত্তপ্ত কটাহে মানুষ পড়িবামাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়। কটাহের চারিদিকে

ভীষণ ভীষণ কতকগুলি লোক উত্তপ্ত লৌহ শলাকা নিয়া বসিয়া আছে। রমণীকে দেখিবামাত্র, সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিশিষ্ট লোকগুলি উল্লাসে মাতিয়া উঠিল এবং রমণীর প্রেতাত্মাটাকে ছিনাইযা নিযা, সেই উত্তপ্ত তেলের ভিতর ঝনাৎ করিয়া ফেলিযা দিল। পরে, হস্তস্থিত সেই প্রচণ্ড উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা তেলের ভিতর ডুবাইযা ধরিল। রমণী চিৎকার করিয়া উঠিল, "উঃ প্রাণ যায়, উঃ প্রাণ যায়; রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই কাতরোক্তি কেহ শ্রবণ করিল না। বরং, সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিগুলি রমণীকে উত্তপ্ত তেলের ভিতর হইতে বারংবার তুলিযা বারংবার ফেলিতে লাগিল।

আবার বিদ্যুৎ চমকিল। আবার দেখিল, কটাহের নিকট প্রতুল যেন দাঁড়াইযা আছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইযা হাসিতেছে, তাহার কাতরোক্তি শুনিযা টিট্‌কারী দিতেছে, হাততালি দিয়া নৃত্য করিতেছে। রমণী প্রতুলকে দেখিযা, প্রাণ রক্ষার্থ যাচ্ঞা করিল। প্রতুল সে কথায় ভ্রূক্ষেপও করিল না। কেবল মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ গৌরমণির তন্দ্রা ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিল— নিকটে কেহই নাই। ভীষণ ভযে, শরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে আবার মূর্চ্ছা গেল। আবার সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

—○○—

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ০—

ভগ্ন প্রাসাদে।

কনকন্ গ্রামে, বহুকালের পুরাতন একটী ভগ্ন প্রাসাদ বর্ত্তমান। প্রাসাদটী নিবিড় জঙ্গলাবৃত; নানাবিধ খাদ্য ও অখাদ্য বৃক্ষে অন্তর্ভূত; সেই বৃক্ষগুলি আবার লতা গুল্মে সমাচ্ছাদিত; মনুষ্য সমাগম রহিত। ছয় মাস হয়, সেই প্রাসাদে আসিয়া, একটী জীর্ণা শীর্ণা রমণী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই রমণীর হাড়ে মাংস লাগিয়াছে; উদরের, বক্ষের ও পৃষ্ঠের হাড়গুলি দেখা দিয়াছে, রমণীর কুটিলকুন্তলগুচ্ছ, রুক্ষ; পিঁরনে, শতগ্রন্থি বিশিষ্ট ছিন্ন ভিন্ন কাপড়। সর্ব্বাঙ্গ, ধূলি ধূসরিত। রমণী, আহারার্থ গ্রামে যায় না, প্রাসাদস্থ বৃক্ষের ফল খাইয়াই জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

সন্ধ্যাদেবী, পরিহিত কৃষ্ণ বসনে, উদয়োন্মুখিনী। সেই কৃষ্ণ বসনের ছায়া, বৃক্ষে, লতায় পাতায় পড়ে পড়ে

হইযাছে। এমন সময, সেই রমণী, সেই প্রাসাদস্থ কক্ষের একটা বাতায়নে বসিল। বাতায়নের সম্মুখে, একটী বেলি ফুলের গাছ। গাছটিতে প্রচুর পরিমাণে ফুল ফুটিয়াছে। দেখিলে বোধহয, ফুলগুলি যেন খল্‌খল্‌ করিযা হাসিতেছে। রমণীর নিকট ফুলের এ হাসি বড় ভাল লাগিল। রমণী দেখিল, একটী প্রস্ফুটিত ফুল ঝরিয়া পড়িল। ফুলটি ঝরিতে দেখিযা, রমণী ভাবিতে আরম্ভ করিল। ভাবিল, মুকুল, এত শীঘ্র হাসিযা বৃন্তচ্যুত হইলে কেন? তোমার কচি বয়স, হাসিমাখা মুখখানি, সুকোমল দেহ লাবণ্য, সৌন্দর্য্যে ঢল ঢল করিতেছিলে; কিছুকাল থাকিলে না, কাহাকে আপনার সৌন্দর্য্য দেখিতে দিলে না, আপনি ফুটিলে আপনি আবার ঝরিযা পড়িলে কেন? আর কিছুকাল থাকিযা, ঝরিয়া পড়িলে দোষ ছিল কি? তুমিও কি আমার ন্যায়, কাহার প্রাণে কষ্ট দিযা, পরিত্যজ্য হইযাছ? সামান্য এক আধ ঘণ্টার নিমিত্ত হাসিলে কেন? এ হাসিতে সুখ কি? বরং কিছুকাল থাকিয়া,—নিজে হাসিযা—মানব হাসাইযা চলিযা যাইতে, তাতে পরম সুখ হইত। এই আসিলে, এই গেলে কেন? তোমার কোমল মরমে কি কোন প্রকার অসহ্য বেদনা পাইয়াছ? বেদনা পাইলেই কি একবারে ঝরিয়া যাইতে হয়? আমিও ত যাতনা পাইয়া, আশায় রহিয়াছি। তুমি কেন থাকিলে না? বুঝেছি, তুমি জীবনের চঞ্চলতা

বুঝাইতে আসিযাছিলে। মেঘ চঞ্চল, ফুল, তুমিও চঞ্চল, বিদ্যুৎ, তরঙ্গ সকলি চঞ্চল। আমার প্রাণও নিযত সচঞ্চল। তবে কেন এ প্রাণ যায না? ফুল, তুমি যে পথে গেলে, আমার দুঃখময জীবনও সে পথে যায না কেন? ছি! আমি তোমার ন্যায নির্জ্জনে মরিতে ভালবাসি না। মরিব তো সেই পদে, যে, সেই পদে মরিতে পারে, সে অনন্তকাল স্বর্গভোগ করে। আমার কি তেমন অদৃষ্ট হইবে?

ইন্দুমতী একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। গণ্ডস্থলে মুক্তালহরী খেলিতে লাগিল। আঁখিজল মুছিযা, আবার ভাবিতে আরম্ভ করিল। ভাবিল, এখন তিনি কোথায? আমাকে কি স্মরণ করেন? আমি কলঙ্কিনী, আমাকে কেন স্মরণ করিবেন? বোধ হয, বিস্মৃত হওয়ার জন্যই চেষ্টা করিতেছেন। গৃহ পরিত্যাগ করিযা অবধি একদিনও ত চিত্ত সুস্থির বোধ হইল না, এ তাপিত পরাণ, সর্ব্বদা কেমন কেমন উদাস্ উদাস্ করিতেছে। এ কষ্টের কি শান্তি নাই? তিনি নব কিশলয পরিশোভিত তরুতলে বসিতে কত ভালবাসিতেন, চাঁদ উঠিলে, চাঁদের কলঙ্ক নিয়া, কত রহস্য করিতেন; তারা ছুটিতে দেখিলে বলিতেন, "ইন্দু, সত্বর গৃহের ভিতর যাও। ঐ দেখ, চাঁদ, তোমার ইন্দুনিভানন দেখিযা, ঈর্ষার বশীভূত হইয়া, তোমাকে লইতে স্বর্গদূত প্রেরণ করিয়াছেন।"

"বউ কথা কও" পাখী ডাকিলে, হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "ইন্দু, সাবধান! কখনও কথা বলিও না, দেখি পাখীটা তোমাকে কত সাধিতে পারে।" কথা বলিতে গেলে, অমনি তাঁহার সুস্নিগ্ধ করতল দ্বারা, আমার মুখখানি চাঁপিয়া ধরিতেন। কিছুতেই কথা বলিতে দিতেন না। তিনি ফুলের হাসি দেখিতে পারিতেন না। বলিতেন, "ফুল, তোমাদের হাসি হইতেও ইন্দুর হাসি সুন্দর।" আমি মরমে মরিয়া যাইতাম। হায়! এখনও ত নব কিশলয় পরিশোভিত কত তরুশ্রেণী দেখিতেছি কিন্তু, কৈ নরেন্দ্রকে ত দেখি না? আর এখনও চাঁদে কলঙ্ক আছে, এখনও তারা ফুটে, 'বৌ' পাখী ডাকে, ফুল হাসে, কিন্তু নরেন্দ্র ত আর তেমন করিয়া, হতভাগিনীকে কিছু বলে না?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, একমাত্র পুত্রের নিধনে মাতার যেমন চিত্তচাঞ্চল্য, ঔদাসীন্য ও চঞ্চলদৃষ্টি জন্মে, ইন্দুমতীর অবস্থাও তেমনি ঘটিল। তখন ইন্দুমতীর পবিত্র হৃদয় সাগর, নরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ-জনিত শোকোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল, উন্মনস্কভাবে ইতস্তত ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিতে লাগিল, চোখের জলে, ইন্দুমতীর পীনোন্নত বিশাল-বক্ষে এক অভিনব বেগবতীর সৃষ্টি হইল, মধ্যে মধ্যে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল, এই ভাবে অতিবাহিত

হইল। ক্রমে চিত্তচাঞ্চল্য কিঞ্চিৎ উপশম হইয়া আসিল। তারপর আবার ভাবিল, খুব বেশ কার্য্য করিয়াছি। এখন আছিও একপ্রকার ভাল। আমার নিমিত্ত শৈলবালা কষ্ট ভোগ করিবে কেন? আমিই বা তাহাকে কষ্ট দিব কেন? তাহাকে না বলিয়া আসিয়াছি, ভালই করিয়াছি! বলিয়া আসিতে পারিতাম না। শৈলবালা যে সে শৈলবালা নহে। সে পরের কষ্ট দেখিতে পারে না। আপনার দুঃখ, যাতনা, প্রাণের ব্যথা ঢাকিয়া রাখিয়াও পরের দুঃখ মোচন করিয়া থাকে। এমন শৈলবালাকে বলিয়া আসিতে পারিতাম কি? কখনই নহে। বলিয়া আসিতে গেলেই, কত কথা, কত কি বলিয়া, মন ফিরাইয়া ফেলিত। না বলিয়া আসিয়া ভালই করিয়াছি। শৈলবালা, এখন সুখী হইতে পারিবে। সে তাহার সুখের পথ, এখন নিজেই খুঁজিয়া লইবে। আমি তাহার সুখের পথে কণ্টক হইয়াছিলাম। পরমেশ্বরের নিকট কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করি, শৈল যেন অচিরকাল মধ্যে সুখের মুখ দেখিতে পায়। আমার সঙ্গে থাকিলে, শৈলবালার কেবল জ্বালাতনই উপভোগ করিতে হইত। নিজের সুখ সম্ভোগের ও স্বার্থের নিমিত্ত পরকে ক্লেশ দেওয়া কি উচিত? শৈলবালা কি আমার জন্য কম কষ্ট স্বীকার করিয়াছে? আমার দুঃখ ঘুচাইবার নিমিত্ত আহার

নিদ্রায, ঝড তুফানে, শীতগ্রীষ্মে পর্য্যন্ত তাহার মনস্তাপ জন্মাইতে পাবে নাই। কি ভাবে আমি সুখে থাকিব, এই চিন্তাই অবিবত কবিয়াছে। এত যে কষ্ট পাইযাছে, তবুও একবাব আপনাব সুখ দুঃখেব কথা ভাবে নাই। ধন্য, শৈল, তোমাব পবোপকাব ব্রত জীবনে! ভগবান অবশ্য তোমাব মনোবথ পূর্ণ কবিবেন।

সহসা, একটী কুমীবাপোকা, আব একটী পোকা মুখে কবিযা, ইন্দুমতীব পাযেব কাছ দিযা, ধীবে ধীবে টানিযা লইযা যাইতেছিল। ইন্দুব হঠাৎ সেই দিকে নজব পডিল। যেই পোকাটিকে ধবিতে যাইবে, অমনি, কুমীবাপোকাটি উড়িয়া গেল। ইন্দমতী, বসিযাছিল, কুমীবাপোকাটিকে উডিতে দেখিয়া দাঁডাইল। পবে, পোকাটিকে অঞ্চলেব আঘাতে মাটিতে ফেলিল। কুমীবা পোকাটি, অন্য পোকটাকে ছাডিযা দিল। ছাডিযা দিযা, ইন্দুমতীব চাবিদিকে উডিযা উডিযা ঘুবিতে লাগিল। ইন্দুমতী অন্য কীটটিকে পাইযা, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল এবং সেটিকে হস্তে কবিযা, নানা প্রকাব যত্ন কবিতে লাগিল। কখনও চুমা দিতে লাগিল, কখনও বা উডাইযা দিবাব চেষ্টা কবিল। কিন্তু, উডাইযা দিতে পাবিল না। এখনও পোকটিব পক্ষ ও উডিবাব শক্তি জন্মে নাই। ইন্দুমতী পোকা পাইযা, ভাবনা ভুলিয়া গেল।

পাঠক, এখানে বলিয়া রাখি, শৈলবালা যে তারাকান্তের নিকট বলিয়াছে, দুষ্ট লোকে ইন্দুমতীকে লইয়া গিয়াছে। সেই অনুমান সম্পূর্ণ ভুল। ইন্দুমতী কেন যে, শৈলবালার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা বোধ হয়, এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। কাজেই, আমরাও আর বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম না।



অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

শুভ মিলন।

রাত্রি চারি দণ্ড উত্তীর্ণ হইয়াছে। সবে এইমাত্র গভীর আঁধার ভেদ করিয়া, শশধর উঠিতেছে, এখনও চাঁদের জ্যোতি পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। কেবল জোছনার আপছায়া দেখা দিয়াছে।

সেই সময়, ইন্দুমতী বাতায়ন হইতে উঠিয়া আসিয়া, কুমীরা পোকাটীকে একটী পরিষ্কার স্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিল। পোকাটি রাখিয়া, গলদেশে অঞ্চল নিবদ্ধ পূর্ব্বক জোড়করে, হাটু পাতিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে বসিল। পরে, অনন্যচিত্তে নিমীলিত লোচনে পতিরূপ চিন্তা করিয়া, ভক্তি-উচ্ছ্বসিত সুস্বর কণ্ঠে পড়িল,—

বন্দে পতিং,

ললিত লাবণ্য লীলাধাম মনোহরং।

ফুল্ল-কুসুম ভূষণ ভূষিত দেহং।

নমামি পঞ্চ প্রাণাধিদেবং।

অবলানাং বলং পতিং,

পতিরেব স্বয়ং হরিঃ,

ব্রহ্মরূপ নমস্তুতে॥

ইহা পড়িয়া, ভূমিতলে পতিত হইয়া, পতির উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া, ভূমিশয্যায় শয়ন করিল। মাথার নীচে একখানা ইষ্টক দিল। কারণ, কক্ষে আর কিছুই ছিল না। থাকিবার মধ্যে কেবল, কক্ষের এক পার্শ্বে কতকগুলি পক্ক ও অপক্ক ফল পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, এই সঞ্চিত ফলেই ইন্দুমতীর প্রাণ রক্ষা হয়। যদিও শয়ন করিবার উপকরণ থাকিত, তথাপি বোধ হয়, ইন্দুমতী ভূমিশয্যায়ই, এইভাবে শয়ন করিত।

ইন্দুমতী, শয়ন করিয়া, প্রথমে নিরতিশয় কাতরকণ্ঠে "হা নরেন্দ্র! হা নরেন্দ্র!" শব্দে কয়েকবার উচ্চধ্বনি করিল। ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। ধ্বনি করিয়া, আবার ভাবিতেছিল যে, কে বলিয়া দিবে, তাহার নরেন্দ্র কোথায়? যে নরেন্দ্রকে

ইন্দুমতীর প্রাণ প্রতিনিয়ত দেখিতে চায়, যাঁহাকে দেখিলে, তাহার চিত্ত চাঞ্চল্য, ঔদাসীন্য, দেখিবার তৃষ্ণা, বিষাদ সকলি দূরীভূত হয়, ইন্দুমতীর এমন স্বজন কে আছে যে, তাহাকে তাহার সেই হৃদয়ধনের কথা বলিয়া দিবে। যদি ইন্দুমতীকে কেহ তাহার হারাণ অমূল্য নিধির কথা বলিয়া দিতে পারে, তবে বুঝি, ইন্দুমতী তাহার পায়ে চিরবিক্রীত হইয়া থাকে। ইন্দু আর কত কাল এভাবে থাকিবে? আর যে তাহার প্রাণে যাতনা সহ্য হয় না। তাহার কপাল মন্দ। সে যে ডাল ধরে, সেই ডালই ভাঙ্গিয়া যায়। এখানে আর কতকাল থাকিবে? যাইবে বা কোথায়? কি করে?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, প্রথমে ইন্দুমতীর চোখে যমনা বহিল, প্রাণ কাঁদিল, শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। তখন ইন্দুমতী দেখিল, তাহার হৃদয়ে, বামে, দক্ষিণে, উচ্চে, নীচে, সম্মুখে, পশ্চাতে কেবলি যেন নরেন্দ্রনাথের ছায়াময় মূর্ত্তি। কিন্তু, সেই মূর্ত্তি অপরিস্ফুট —অপরিদীপ্ত—যেন কেমন কেমন। হাত দেখে ত পা দেখে না, মুখমণ্ডল দেখে ত শরীর দেখে না; একটা দেখিলে আর একটা দেখিতে পায় না। এই অবস্থায়, ইন্দুমতীর অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

কিন্তু, ক্রমশ যতই একাগ্রচিত্তে নরেন্দ্রের বিষয় ভাবিল, ততই ইন্দুমতীর প্রাণে গভীর তন্ময়তা জন্মিল।

এখন ইন্দুমতীর হৃদয়ময় নরেন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি জাজ্বল্যমান প্রদীপিত হইল। ইন্দুমতী, সেই মূর্ত্তি দেখিয়াও নির্ব্বিকার—স্থির—অচল। ইন্দুর নাই হাসি, নাই হর্ষ। হর্ষ বিষাদ থাকিবে কি প্রকারে? ইন্দমতী যে নরেন্দ্রনাথে তন্ময়।

যখন ইন্দমতী ভক্তি-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পতির ধ্যান পড়িতেছিল, তখন একটী লোক পায়ের আঙ্গুলের মাথায় ভর দিয়া, খুব পা টিপিয়া টিপিয়া, খুব সাবধানে, খুব সতর্কভাবে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া, একটী উন্মুক্ত জানালা পথে উঁকি দিয়া, এ সমস্ত দেখিতেছিল। তখন চাঁদের কোমল মধুর কিরণ, বৃক্ষের পাতা ভেদ করিয়া, অল্প অল্প কক্ষের ভিতরে পতিত হইয়াছিল। সেই কিরণে কক্ষটী একটু ফরশা হইয়াছিল মাত্র। আবার সেই ফরশায় কক্ষের সমস্তই এককূপ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

যাহাহউক, ইন্দমতী যতই 'হা নরেন্দ্র, হা নরেন্দ্র বলিয়া কাতরোক্তি প্রকাশ করিতেছিল, ততই লোকটীর বক্ষ যেন কষ্টে দুই খণ্ড হইয়া যাইতেছিল। আর অবিশ্রান্ত নয়নাশ্রু ঝরিতেছিল। লোকটী সেই কাতরোক্তি শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইন্দমতীর বক্ষ ফাটিয়া, হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া, পাঁজর ভাঙ্গিয়া, নরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ-জনিত শোক উদ্দীপ্ত হইতেছিল লোকটী এসব বুঝিতে পারিয়া, পুনবায় অত্যন্ত পা টিপিয়া টিপিয়া,

খুব সাবধানে একবারে কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্র অতি সহজে দেখিল, রমণীর চির-প্রফুল্ল বদন সরোজ বিষণ্ণ; কপোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে; শরীর জীর্ণ; হাড়ে মাংস লাগিয়া গিয়াছে; লাবণ্যবিভার চিহ্ন মাত্র নাই। শুষ্ক মৃণালবৎ দেহখানি।

সেই সময়, ইন্দুমতী তন্ময়াবস্থতেই বলিল,

"হা ভগবান, সেই তারা, সেই চাঁদ, সেই আকাশ, সেই সব—সেই সব। কিন্তু—"

লোকটী ইন্দুমতী হইতে একটু তফাতে ছিল। একথা শুনিয়া, অতি সন্তর্পণে দুই পা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল। ইন্দুমতী আবার বলিল,

"সেই ইন্দু, আর এই ইন্দু কত প্রভেদ?"

ইন্দুমতী টের না পায়, এমতভাবে লোকটী আর এক পা অগ্রবর্ত্তী হইল। অতি ধীরে ও অত্যন্ত আস্তে বলিল, "স্বর্গ আর মর্ত্ত।"

এ কথাতে ইন্দুমতীর তন্ময়তাভাব ভাঙ্গিল না। বলিল, "স্বর্গে মর্ত্তে সম্বন্ধ নেই কি?"

পূর্ব্বের ন্যায় লোকটী আবার দুই পা অগ্রসর হইল। আবার অতি শান্ত ও কোমলভাবে বলিল, "আছে!"

বলিয়া লোকটী কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী হইল। এখন লোকটী ইন্দুমতীর মস্তকের অতি সন্নিকট। সহসা ইন্দুমতীর দক্ষিণ হাতখানা, লোকটীর পায়ের উপর

পড়িল। পড়িবা মাত্র, "বড় শীতল—বড় শীতল, এ যে আমার নরেন্দ্রের পায়ের ন্যায় শীতল!" এই বলিয়া চমকিয়া উঠিল। তন্ময়তা ভাঙ্গিল। দেখিল, সম্মুখে নরেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান।

তখন ইন্দুমতীর হৃদয় কাঁপিল, প্রাণ কাঁপিল, সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল; মুখে একটী কথাও ফুটিল না, কি যে তখন করিতে হইবে তাহাও বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে না পারিয়া, পদদ্বয় ধারণ করিল। পরে, সকাতরে প্রাণের আবেগে কহিল,

"নরেন্দ্র, এত দিনে কি হতভাগিনীকে দয়া করিতে এসেছ?"

আর বলিতে পারিল না। প্রাণ ফাটিয়া এই কয়টা কথাই মাত্র বহির্গত হইল। উদ্বেলিত প্রাণে কাঁদিতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথ, ইন্দুমতীর কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেবল ইন্দুমতীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া, বক্ষের ভিতর টানিয়া লইল। ইন্দুমতীও বাহু পাশে নরেন্দ্রনাথকে জড়াইয়া ধরিল। তখন তাহাদের প্রাণের ভিতর কি যে ভাবের উদ্রেক হইল, তাহা লেখা যায় না—প্রাণে ফুটে না। তাহা অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয়। তাই, বোধ হয়, উভয়ের সংমিলিত বিশাল বক্ষস্থল, উভয়ের সংমিলিত অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কাহার মুখে কোন

কথা ফুটিল না, কেহ কাহার পানে চাহিতে পারিল না। কেবল সেই অশ্রুবিন্দুই যেন তাহাদের প্রাণের মর্ম্মান্তিক হৃদয়স্পর্শী বেদনা, নীরবে প্রকাশ করিতে লাগিল। ইন্দুমতীও নরেন্দ্রনাথের বক্ষস্থলে কাঁদিতেছিল।

নরেন্দ্রনাথ মহাপুরুষের আদেশানুসারে অনেক অন্বেষণ করিয়া, এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।



পরিশিষ্ট।

—০—

লীলাবসান।

যথাসময়ে, নবেন্দ্রনাথ ও ইন্দুমতী বাড়ী আসিয়া পোঁছিল। ইহাদেব আগমন সংবাদে, গ্রামের সমস্ত লোক আনন্দোৎফুল্ল হইযা উঠিল। কিন্তু, নবেন্দ্রেব হৃদয়ে আনন্দ জন্মিল না। কাবণ, বাযমহাশয ও গিন্নী, তাহাব শোকে, এ সংসাব পবিত্যাগ কবিয়া, পবলোক গমন কবিযাছেন। তাঁহাদেব শোকেই নবেন্দ্র কিছু দিন পর্য্যন্ত শোকাচ্ছন্ন ছিল। পবে, বীতিমত সংসাবসুখে নিমগ্ন হইল। আমবা শুনিয়াছি নবেন্দ্রের আচবণে ও কার্য্য পবম্পবায কি গ্রাম্য লোক, কি প্রজা, কি পবিচিত কি অপবিচিত, সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট লাভ কবিতে লাগিল।

নবেন্দ্রকে যে মহাপুরুষ অন্তবীক্ষ হইতে ইন্দুমতীব কথা বলিয়া দিযাছিলেন, সেই মহাপুরুষও নবেন্দ্রেব সহিত সাক্ষাৎ কবিয়াছিলেন। তিনিই, নবেন্দ্রেব প্রাণদাতা। ইন্দুমতীব প্রতি নবেন্দ্রনাথেব প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস ও ভালবাসা আছে কি না, ইহা পবীক্ষার্থ নবেন্দ্রনাথ আশ্রমে থাকিতে, ইন্দুমতীব কথা কিছুই বলেন নাই। সংগোপনে সংগোপনে নবেন্দ্রনাথেব পশ্চাৎ আসিয়া, পথিমাঝে, তাহা পবীক্ষা কবিয়াছিলেন

এবং জানিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ প্রকৃতই ইন্দুমতীকে ভালবাসে। ইহা জানিয়াই ইন্দুমতীর কথা বলিয়া দিয়াছিলেন।

মাধুরীর স্বামী সন্ন্যাসব্রতই অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া, এসমস্ত কথা জানিয়াছি। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, জন্মভূমি একবার দেখিতে হয়। তন্নিমিত্তই মাধুরীর স্বামী যোগীবেশে দেশে আসিয়াছিলেন।

গৌরমণিকে মুমূর্ষ অবস্থায় দেখিয়াছি। তারপর, যে তাহার কি হইল বলিতে পারি না। বোধ হয়, তাহার দেহ শৃগাল কুকুরের উদরস্থ হইয়া থাকিবেক। দোবে-ঠাকুর গৌরমণির লাঞ্ছনা দেখিয়া, ভয়ে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গোপনে প্রস্থান করিয়াছে।

নরেন্দ্রের বাড়ী আগমনের এক বৎসর পর, রামভদ্র দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। দেশে আসিয়া অল্প কতকদিন জীবিত ছিল মাত্র।

কিছুদিন পর, তারাকান্ত ও শৈলবালা বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা ইন্দুমতী ও নরেন্দ্রের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, সহর্ষে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তারাকান্ত যে নরেন্দ্রকে খুঁজিতে গিয়াছিল, নরেন্দ্র তাহা বাড়ী আসিয়াই জানিতে পারিয়াছিল। তারাকান্তের সহিত শৈলবালার বিবাহ হয়। এ কার্য্যে নরেন্দ্র প্রথমেই উদ্যোগী ছিল; কিন্তু, ইন্দুমতীর বিচ্ছেদে

সেটি তখন হইতে পারে নাই। শৈলবালা মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া, গৃহ পরিত্যাগের পর, ইন্দু যাহা যাহা করিয়াছিল, তাহা বলিয়া হাসিত—হাসাইত।

সেই সময় ইন্দুমতী নিকটে থাকিলে শৈলবালার আর নিস্তার থাকিত না। ইন্দু শৈলবালাকে যথোচিত বিরক্ত করিত। নরেন্দ্র সেই সমস্ত কথা লইয়া, ইন্দুর সহিত রহস্য ও কৌতুক করিত। নরেন্দ্র ও ইন্দুমতী উভয়েই উভয়ের বিচ্ছেদের পরের ঘটনাবলী একে অন্যের নিকট বলিয়াছিল। যখন সেই সমস্ত কথা উঠিত, তখন উভয়েই ব্যাকুল প্রাণে কাঁদিত। এইরূপে তাহাদের সুখের জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

আমরা এখানে গ্রন্থ শেষ করিলাম।

সম্পূর্ণ।